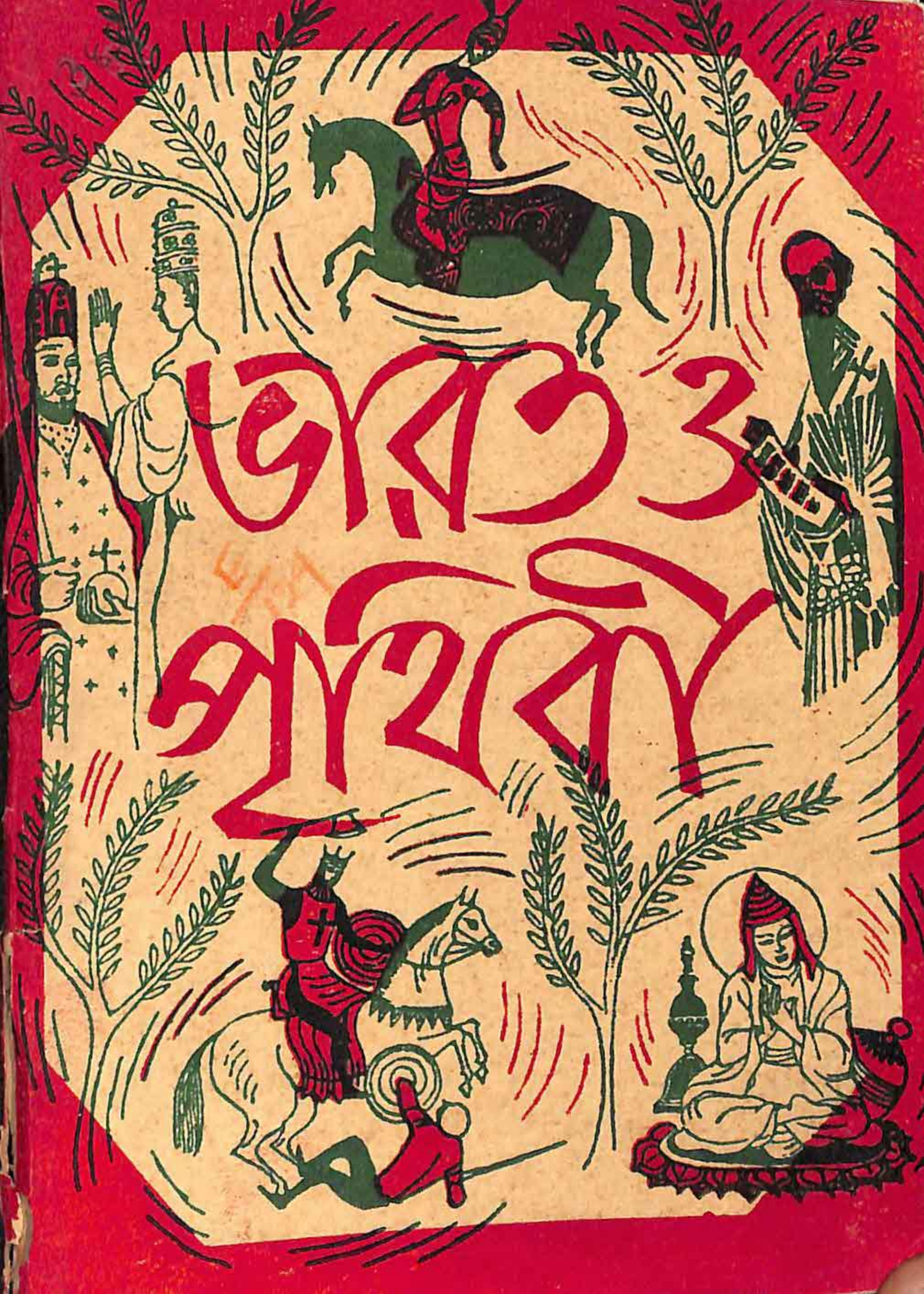


Revised and re-approved by the Board of Secondary Education, W. B.
(Vide Board's letter No. 27802/G, dated 22 10. 63)

Approved by the Board of Secondary Education, West Bengal, as a Text-Book in History for Class VII. (Vide S. E. Board's Notification Syl. 67/54 dated 3-12 54 ; and later Notifications and Circulars up to date)

ভারত ও পৃথিবী

[মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ-এর নূতন পাঠ্যসূচী অনুসারে
সপ্তম শ্রেণীর জন্য সংশোধিত সংস্করণ]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শতবার্ষিকী
অধ্যাপক, মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ
শ্রী অ নি ল চ ন্দ্র ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়
এম. এ., পি-এইচ. ডি., প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ স্কলার

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লি : : কলিকাতা-১২

সপ্তম সংস্করণ : পৌষ, ১৩৭১

সংশোধিত ষষ্ঠ সংস্করণ, পৌষ, ১৩৭০
মূল্য টা. ১·৫৮ (এক টাকা আটান্ন পয়সা) মাত্র

প্রকাশক :
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টর
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর :
শ্রীরামচন্দ্র দে
ইউনাইটেড আর্ট প্রেস
২৫বি, হিদারাম ব্যানার্জী লেন,
কলিকাতা-১২

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

'বর্বর' জাতিসমূহের আক্রমণ

রোম সাম্রাজ্যের পতন

সমগ্র ভূমধ্যসাগর অঞ্চল কয়েক শতাব্দী কাল রোমের শাসনে শান্তি ও সমৃদ্ধি ভোগ করে, পৃথিবীর এক বৃহৎ অংশে নানা দিকে সভ্যতার উন্নতি হয়। রোম সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে কয়েক শত বৎসরের জন্য মানুষের এই অগ্রগতির পথ রুদ্ধ হইল। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের ঐক্য বিনষ্ট হইল, পশ্চিম ইউরোপে অন্ধকার নামিয়া আসিল।

রোমের বিশাল সাম্রাজ্য একদিনে ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষভাগে ইহার পতনের সূচনা হয়, পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে পশ্চিম ইউরোপে রোমের অধিকার বিলুপ্ত হয়। পতনের যুগে সম্রাটদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন দুর্বল বা অত্যাচারী। তাঁহারা সাম্রাজ্যের সুশাসনের বন্দোবস্ত করিতে পারেন নাই, প্রজাদের উপর অত্যাচার করিয়া নিজেরা বিলাসে কাল কাটাইতেন। অভিজাত শ্রেণীর বিত্তশালী ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা সম্রাটের কুদৃষ্টান্ত অনুসরণ করিতেন। রোমের ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়া, সাম্রাজ্যের মঙ্গলের দিকে না চাহিয়া তাঁহারা বিলাসের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিতেন। যে সৈন্যদের উপর সাম্রাজ্য রক্ষার ভার, তাহারা নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি

করিত ; কোন্ দলের মনোনীত ব্যক্তিকে সম্রাটের সিংহাসনে বসাইবে তাহা লইয়া ঝগড়া, এমন কি যুদ্ধবিগ্রহ পর্যন্ত চলিত। জনসাধারণ উচ্চ হারে কর দিতে দিতে দরিদ্র হইয়া পড়িল। দাসদিগের উপর অকথ্য অত্যাচার ও উৎপীড়ন চলিত। রাজ-শক্তির দুর্বলতা ও জনসাধারণের অসন্তোষ সাম্রাজ্যকে অন্তঃসার-শূন্য করিয়া দিল। বিভিন্ন প্রদেশে বারবার বিদ্রোহ হইল।

রোমের যখন এইরূপ দুরবস্থা তখন মধ্য ইউরোপের আদিবাসী দুর্দান্ত জার্মান জাতির বিভিন্ন শাখা সাম্রাজ্য আক্রমণ করিল। রোমের সুসভ্য অধিবাসীদের কাছে অসভ্য জার্মানরা ছিল 'বর্বর' (Barbarians)। কিন্তু 'বর্বর' জাতির অদম্য সাহস ও বাহুবল ছিল, সুসভ্য রোমের সামরিক বল নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। তাই 'বর্বর' জাতির আক্রমণে রোমের বিশাল সাম্রাজ্য মাটির ঘরের মত ভাঙ্গিয়া পড়িল।

'বর্বর জার্মান'

'বর্বর' জার্মানদের সহিত রোমের প্রথম সংযোগ ঘটিয়াছিল বহুদিন আগে, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে। মহাবীর জুলিয়াস সীজার গল (Gaul—বর্তমান ফ্রান্স) জয় করিয়া রোম সাম্রাজ্যের সীমা জার্মানদের দেশ পর্যন্ত প্রসারিত করেন। তাঁহার লেখা একখানি বইতে সেকালের জার্মানদের খাদ্য, সাজ-পোষাক, আচার-ব্যবহার, শাসন-পদ্ধতি প্রভৃতির বর্ণনা আছে। সীজারের পর ট্যাসিটাস্ (Tacitus) নামে রোমের এক ঐতিহাসিক জার্মানদের সম্বন্ধে এক বিবরণী লিখিয়াছিলেন।

এই দুইজনের লেখা পড়িলে আমরা সেকালের জার্মানদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা করিতে পারি।

জার্মানদের দেহ ছিল লম্বা ও বলিষ্ঠ, চুল টক্‌টকে লাল, চোখ নীল। তাহারা যে ভাষায় কথা বলিত তাহা আর্যভাষা —রোমের ভাষা ল্যাটিনের সহিত তাহার খানিকটা মিল ছিল। তাহারা যে সকল গ্রামে বাস করিত সেগুলি মাঠের মধ্যে এদিকে ওদিকে ছড়াইয়া থাকিত। শত্রুর আক্রমণ হইতে গ্রামগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য অনেক সময় উহাদের চারিদিকে ছুঁচালো কাঠের টুকরা সাজাইয়া বেড়া দেওয়া হইত। বাড়ীগুলি ছিল মাটির তৈরী, বাড়ীর কাঠামো কাঠের তৈরী। খড় বা লতাপাতা দিয়া ঘরের চাল তৈরী হইত। প্রচণ্ড শীতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য জার্মানরা মাঝে মাঝে মাটির নীচে গুহার মত গর্ত করিয়া উপরে গোবরের স্তূপ জমাইয়া রাখিত, নিজেরা ঐ গর্তের মধ্যে থাকিত। সঞ্চিত শস্য নিরাপদে রাখিবার জন্যও এই সকল গর্ত ব্যবহার করা হইত। পুরুষেরা পশুচর্মে দেহ আবৃত করিত, মেয়েরা চিত্রিত সূতী কাপড় পরিত।

সাধারণ জার্মান-গৃহে বৃদ্ধেরা এবং মেয়েরা বাড়ীর কাজ করিত, জমি চাষ করিত; যুবকেরা এবং মধ্যবয়সী পুরুষেরা যুদ্ধ করিত, যুদ্ধ না থাকিলে বাড়ীতে খাইয়া ঘুমাইয়া আরামে দিন কাটাইত। শিকার করা, মাছ ধরা, পশুপালন করা দৈনন্দিন কাজের মধ্যে গণ্য হইত। আমাদের দেশের মত জার্মানদের দেশেও বলদ চাষের লাঙ্গল টানিত। ভোজ, জুয়াখেলা, রথের দৌড় প্রভৃতি ছিল প্রধান আমোদ-প্রমোদ।

জার্মান পুরুষেরা বেশ সাহসী ও যুদ্ধপ্রিয় ছিল। পাথরের বা কোন ধাতুতে তৈরী কুঠার, তরবারি, ছোরা, বর্শা প্রভৃতি অস্ত্র যুদ্ধে ব্যবহৃত হইত। ঢালগুলি নানারকম রঙে চিত্রিত করা থাকিত। পদাতিকের সংখ্যাই বেশী, কেহ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়াও যুদ্ধ করিত। বীর জার্মানরা গান করিতে করিতে যুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িত। যোদ্ধার পক্ষে পরাজয় স্বীকার করা বা ঢাল ছাড়িয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করা চরম অপমান বলিয়া মনে করা হইত। অনেক সময় বর্মত্যাগী যোদ্ধা অপমান এড়াইবার জন্য আত্মহত্যা করিত। মেয়েদেরও সাহস কম ছিল না।

জার্মানরা বিভিন্ন কুলে (tribe) বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক কুলের একটি সাধারণ সভা ছিল। যাহারা স্বাধীন মানুষ (freemen)—অর্থাৎ দাস নয়—কেবলমাত্র তাহারাই এই সভায় যোগ দিতে পারিত। যুদ্ধ প্রভৃতি গুরুতর সমস্যা সম্বন্ধে এই সভায় আলোচনা হইত, পরে সভার মত অনুসারে কাজ করা হইত। সভার আর একটি কাজ ছিল—অপরাধীদের বিচার করিয়া শাস্তি দেওয়া। কোন কোন কুল নির্বাচিত দলপতির অধীন ছিল, আবার কোন কোন কুলে একজন রাজা থাকিতেন। রাজা সকল সময় নিজের ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিতেন না, গুরুতর বিষয়ে তাঁহাকে সভার মত লইতে হইত।

জার্মান-সমাজে প্রধান শ্রেণী ছিল তিনটি। সকলের উপরে ছিলেন অভিজাতগণ। তাঁহারা সাধারণতঃ অশ্বপৃষ্ঠে বসিয়া যুদ্ধ করিতেন। সামাজিক মর্যাদার চিহ্নস্বরূপ তাঁহাদের বহু-বিবাহের অধিকার ছিল। স্বাধীন ব্যক্তিরা (freemen)

কুলের সভায় উপস্থিত হইয়া সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিতে পারিত। দাসদের (serfs) এই অধিকার ছিল না। প্রভুর জমি চাষ করাই দাসের প্রধান কাজ ছিল।

সীজার ও ট্যাসিটাস্ যে জার্মানদের কথা বলিয়াছেন তাহারা আমাদের হিসাবে সভ্য ছিল না। শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে তাহারা কোন কৃতিত্ব দেখাইতে পারে নাই। সভ্যতার আদি যুগের মানুষের মত তাহারা গ্রাম্যজীবন যাপন করিত, কৃষিকার্যে ও যুদ্ধে তাহাদের সময় কাটিত। কিন্তু সভ্য রোম সাম্রাজ্যের অধিবাসীদের তুলনায় শরীরের ও মনের বলে তাহারা অনেক বড় ছিল। নূতন মানুষের অফুরন্ত উৎসাহ ও শক্তি লইয়া তাহারা পুরাতন, পরিশ্রান্ত রোমের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল।

'বর্বর' জাতির রাজ্যগঠন

ট্যাসিটাস্ বলিয়াছেন, জার্মানদের দেশ গভীর অরণ্যে ও জলাভূমিতে ঢাকা ছিল। সেখানে যথেষ্ট শস্যোৎপাদনের সুবিধা না থাকায় তাহারা খাদ্যাভাবে কষ্ট পাইত। যখন তাহাদের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল তখন আদিম পিতৃভূমিতে থাকা তাহাদের সকলের পক্ষে আর সম্ভব হইল না। রাইন ও ডানিউব নদীর উত্তরে খাদ্যাভাবে পীড়িত 'বর্বর' জার্মান জাতির বাস, আর উহার ঠিক দক্ষিণে রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্গত অঞ্চলে চাষের সুন্দর ব্যবস্থা এবং খাদ্যের প্রাচুর্য! তাই রোম সাম্রাজ্যে সহজে প্রচুর খাদ্য সংগ্রহ করিবার আশায় জার্মানরা ঐ নদী দুইটি পার হইয়া উত্তর হইতে দক্ষিণে অগ্রসর হইতে লাগিল।

কেবল যে পুরুষেরাই লুটপাট করিবার জন্য আসিত তাহা নয়। জার্মান যোদ্ধারা সপরিবারেই আসিত, সঙ্গে থাকিত গরু-ঘোড়া এবং অন্যান্য পারিবারিক অস্থাবর সম্পত্তি। অর্থাৎ জার্মান জাতি খাদ্য-সমস্যা মিটাইবার জন্য পিতৃভূমি ত্যাগ করিয়া স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল।

শুধু খাদ্যাভাব নয়, অন্য সমস্যাও ছিল। অনেক সময় একটি 'বর্বর' জাতি আর একটি 'বর্বর' জাতিকে রোম সাম্রাজ্যের দিকে ঠেলিয়া দিত। উত্তর, মধ্য এবং পূর্ব ইউরোপে তখন রাজনৈতিক শৃঙ্খলা ছিল না। 'বর্বর' জাতিরা পরস্পরের সহিত যুদ্ধ করিত, বিপদের সময় এক অঞ্চল হইতে অপর অঞ্চলে চলিয়া যাইত। যতদিন রোমের সামরিক বল অক্ষুণ্ণ ছিল ততদিন তাহারা সাম্রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে পারে নাই। রোম দুর্বল হইয়া পড়িলে তাহারা সেই সুযোগ পাইল।

আবার কোন কোন সময় রোম সাম্রাজ্যের সীমান্তবাসী কোন কোন 'বর্বর' জাতি রোমের অধীনতা স্বীকার করিত, সেই জাতির যোদ্ধারা রোমের সৈন্যদলে প্রবেশ করিত। বেতনের লোভ ছাড়া লুটপাটের সুযোগও ছিল। 'বর্বর' জাতীয় সৈনিকদের মধ্যে অনেকে স্থায়ী ভাবে ইটালীতে বাস করিত।

দুর্দান্ত হূণ জাতির আক্রমণ জার্মানদিগকে রোম সাম্রাজ্যের ভিতরে ঠেলিয়া দিয়াছিল। হূণেরা মোঙ্গল জাতির এক শাখা। তাহারা মধ্য এশিয়া হইতে লুটপাট করিতে করিতে ইউরোপে উপস্থিত হয়। যাযাবর হূণেরা কোনও এক জায়গায় বেশীদিন

থাকিত না। তাহারা সুদক্ষ অশ্বারোহী, ঘোড়ায় চড়িয়া দেশ-দেশান্তরে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহাদের সাহস, ক্ষিপ্রতা ও নিষ্ঠুরতা নানা দেশের মানুষকে চমকিত করিয়াছিল। নিরীহ স্ত্রীলোক ও শিশুকে পায়ের নীচে ফেলিয়া পিষিয়া মারিতে তাহারা ইতস্ততঃ করিত না। নরমাংস ভোজনে তাহাদের অপ্রবৃত্তি ছিল না।

চতুর্থ শতাব্দীতে হূণ আক্রমণকারীদের ভয়ে 'ভিসি-গথ' (Visigoths) নামে জার্মান জাতির এক শাখা রোম সাম্রাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করে। ইহার পর একই কারণে 'ভ্যাণ্ডাল' (Vandals) এবং 'অস্ট্রো-গথ (Ostrogoths) জাতিও তাহাদের অনুসরণ করে। রোমের দুর্বল সৈন্যদল বারবার এই সকল 'বর্বর' জাতির নিকট পরাজয় স্বীকার করিল। শেষে ভিসি-গথদের রাজা অ্যালারিক (Alaric) রোম আক্রমণ ও লুণ্ঠন করিলেন। সমগ্র সাম্রাজ্যে রোমের চরম দুর্দশার কাহিনী প্রচারিত হইল। ইহার পর ভ্যাণ্ডালেরা একবার রোম লুণ্ঠন করে।

এই সকল ঘটনায় রোমের দুর্বলতার পরিচয় পাইয়া 'বর্বর' জাতিগুলির সাহস বাড়িয়া গেল ; তাহারা ক্রমে ক্রমে সাম্রাজ্যের কয়েকটি প্রদেশ অধিকার করিয়া রাজ্যস্থাপন করিল। বর্তমান অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী অঞ্চলে এবং ইটালীর উত্তর ভাগে অস্ট্রো-গথদের রাজ্য স্থাপিত হইল। স্পেন ও ফ্রান্সের একটি অংশ ভিসি-গথদের অধিকারে গেল। ভ্যাণ্ডালদের রাজ্য স্থাপিত হইল উত্তর আফ্রিকায়। 'ফ্রাঙ্ক' (Franks) নামে জার্মান জাতির

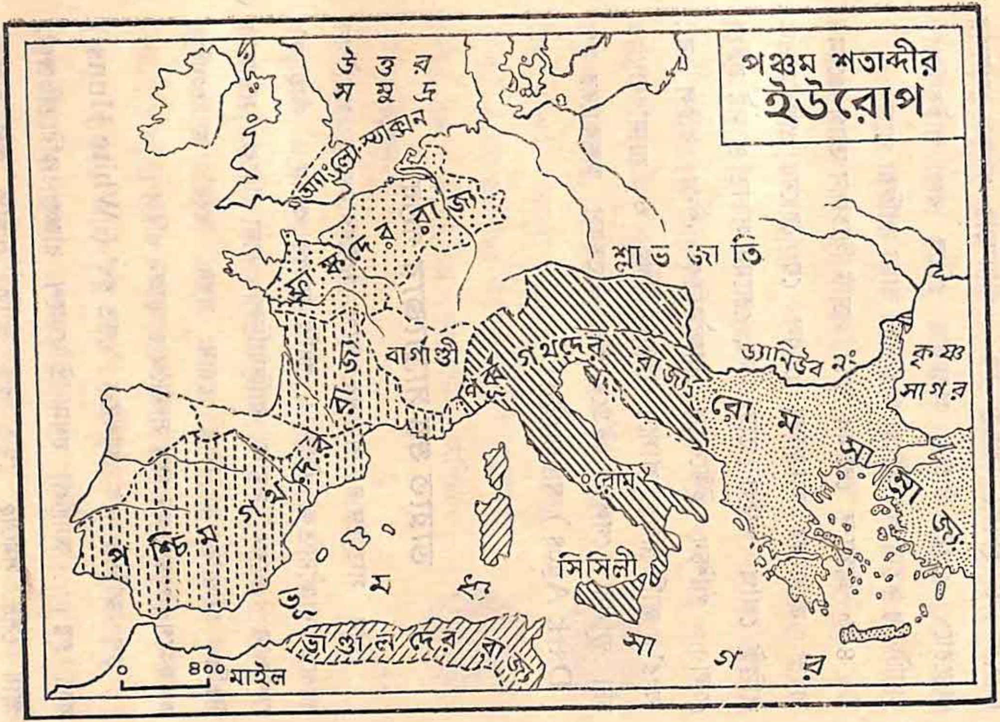
এক শাখা বর্তমান ফ্রান্সে রাজ্যগঠন করিল। রোমের সৈন্যদল ব্রিটেন হইতে চলিয়া আসিবার পর সেখানে অ্যাংলো-স্যাক্সন নামে জার্মান জাতির আর এক শাখা প্রবেশ করিল। এইরূপে



অস্ট্রো-গথ' জাতীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি

পশ্চিম ইউরোপে রোমের সাম্রাজ্য টুকরা টুকরা হইয়া গেল, এবং 'বর্বর' জাতিদের নূতন নূতন রাজ্য গড়িয়া উঠিল।

হূণেরা হাঙ্গেরী অঞ্চলে একটি রাজ্যস্থাপন করিয়া কিছুকাল সেখানে বাস করে। পরে তাহারা পশ্চিম ও দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। তাহাদের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা অ্যাটিলা (Attila) ইউরোপ হইতে এশিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল অঞ্চলের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার কুৎসিত দেহ ও নিষ্ঠুর হৃদয় বহু জাতির মনে ভয় জাগাইত। তাঁহার আক্রমণে গল


পঞ্চম শতাব্দীর
ইউরোপ
উত্তর সমুদ্র
অ্যাংলো-স্যাক্সন
ফ্রাঙ্কদের রাজ্য
শ্লাভ জাতি
বার্গাণ্ডী
ভিসিগথদের রাজ্য
পশ্চিম গথদের রাজ্য
অস্ট্রগথদের রাজ্য
ড্যানিউব নং
কৃষ্ণ সাগর
রোম সাম্রাজ্য
রোম
সিসিলী
ভূমধ্য সাগর
ভ্যাণ্ডালদের রাজ্য
০ ৪০০ মাইল

(ফ্রান্স) ও ইটালী বিধ্বস্ত হয়। খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু পোপের অনুরোধে রোম তাঁহার অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইয়াছিল। অ্যাটিলার মৃত্যুর পর ইউরোপে হূণদের রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে।

৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমের শেষ সম্রাট সিংহাসন ত্যাগ করেন। 'বর্বর' জাতিদের আক্রমণে কেবল যে রোমের রাজনৈতিক শক্তিই লোপ পাইল তাহা নয়, রোমের সভ্যতাও নষ্ট হইয়া গেল। পশ্চিম ইউরোপে রাজনৈতিক ঐক্য রহিল না, 'বর্বর' জাতিগুলির শাসনে লোকে শিল্প ও জ্ঞানবিজ্ঞানের চর্চা ভুলিয়া গেল। ইউরোপের ইতিহাসে অন্ধকারের যুগ (Dark Ages) আরম্ভ হইল।

ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন

রোম সাম্রাজ্যের পতনের যুগে মগধের গুপ্ত সম্রাটগণ ভারতে রাজনৈতিক ঐক্য ও শান্তি স্থাপন করেন। তাঁহাদের সুশাসনে দেশের সমৃদ্ধি বাড়িয়াছিল, নানা দিকে সভ্যতার উন্নতি হইয়াছিল। কিন্তু রোম যখন 'বর্বর' জাতিগুলির আক্রমণে বিপন্ন তখন গুপ্ত সাম্রাজ্যেও ভাঙ্গন ধরিল।

হূণ জাতির এক শাখাকে 'শ্বেত হূণ' (White Huns) বলা হয়। অ্যাটিলা যখন ইউরোপে রাজত্ব করিতেছিলেন, প্রায় সেই সময়েই শ্বেত হূণ জাতি ভারতে গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। ইউরোপের মত ভারতবর্ষেও হূণেরা অবর্ণনীয় বর্বরতার পরিচয় দিয়াছিল।

গুপ্তবংশীয় সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের কাহিনী তোমরা পড়িয়াছ। তাঁহার পৌত্র স্কন্দগুপ্ত যখন মগধের সম্রাট তখন উত্তর-পশ্চিম ভারতে হূণ আক্রমণ আরম্ভ হয়। তখনও গুপ্ত সাম্রাজ্য একেবারে দুর্বল হইয়া পড়ে নাই। স্কন্দগুপ্ত হূণদিগকে পরাজিত করিয়া সাম্রাজ্য রক্ষা করেন। তাহারা উত্তর-পশ্চিম ভারতে গান্ধার অঞ্চলে একটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল, কিন্তু স্কন্দগুপ্তের জয়লাভের পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর আর গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই। কিছুকাল পরে তোরমান নামে এক হূণ রাজা উত্তর-পশ্চিম ভারত হইতে অগ্রসর হইয়া পশ্চিম ও মধ্য ভারতের খানিকটা জয় করেন। তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের খানিকটা অধিকার করিয়াছিলেন।



হূণরাজ তোরমানের মুদ্রা

রোমের শেষ সম্রাটের সিংহাসন ত্যাগের কিছুকাল পরে তোরমানের পুত্র মিহিরকুল (বা মিহিরগুল) উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি বৃহৎ রাজ্য শাসন করিতেন। কাশ্মীর হইতে মধ্য-ভারত পর্যন্ত তাঁহার অধিকার প্রসারিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ পশ্চিম পঞ্জাবের অন্তর্গত শিয়ালকোটে তাঁহার রাজধানী ছিল। মগধের গুপ্তবংশীয় সম্রাট নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য একবার তাঁহাকে বন্দী করিয়াও দয়াপরবশ হইয়া তাঁহার প্রাণ ভিক্ষা দিয়াছিলেন। শেষে মালবের রাজা যশোধর্মন্ মিহিরকুলকে পরাজিত করেন। মিহিরকুল অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী ছিলেন। তাঁহার হুকুমে বড় বড় হাতী পাহাড়

হইতে গড়াইয়া নীচে ফেলিয়া দেওয়া হইত—তিনি উপরে দাঁড়াইয়া হাতীর মৃত্যুযন্ত্রণায় আমোদ উপভোগ করিতেন।

মিহিরকুলের পরাজয়ের পর হূণেরা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তাহারা ভারতে আর কোন বড় রাজ্য স্থাপন করিতে পারে নাই। কিন্তু তাহারা স্থায়ী ভাবে এদেশে বাস করিতে লাগিল। কালক্রমে তাহারা হিন্দু-সমাজে মিশিয়া গেল। সেকালে হিন্দুদের সহিত হূণদের বিবাহ হইত। রাজপুতদের মধ্যে হূণ নামে একটি কুল (tribe) আছে। বোধ হয় হূণদের মধ্যে একদল হিন্দু হইয়া রাজপুত-সমাজে প্রবেশ করে।

হূণ আক্রমণের ফলে এবং অন্যান্য কারণে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন হইল। ভারত আবার রাজনৈতিক ঐক্য হারাইল। কিন্তু রোমের সভ্যতার মত ভারতের সভ্যতা বিনষ্ট হয় নাই। ভারতে বিভিন্ন প্রদেশে ছোট ছোট রাজ্যের উৎপত্তি হইল। ভারতের সাহিত্য ও শিল্পের আর তেমন উন্নতি না হইলেও তাহারা বাঁচিয়া রহিল।

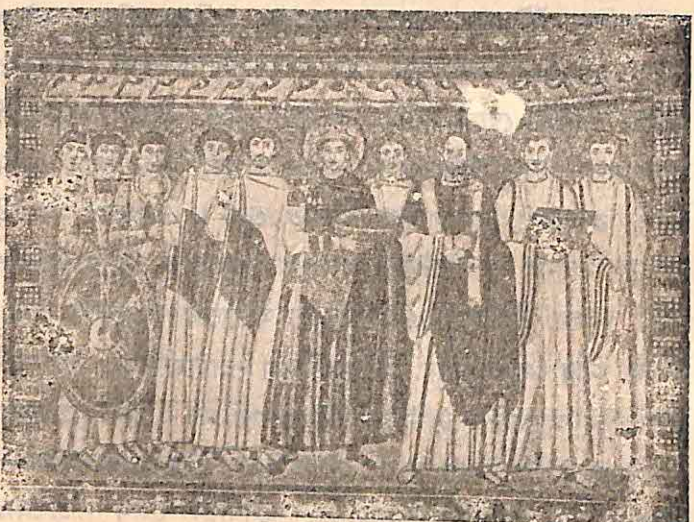
খ্রীষ্টাব্দ	
	—১৪ রোমের প্রথম সম্রাট অগস্টাসের মৃত্যু
	—৩৭৬ 'ভিসি-গথ' জাতির রোম সাম্রাজ্যে প্রবেশ আরম্ভ —'বর্বর' জাতির আক্রমণের সূত্রপাত
	—৪৫৩ অ্যাটিলার মৃত্যু
	—৪৬৭ স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু
	—৪৭৬ রোমের শেষ সম্রাটের পদত্যাগ
	—৫১৫ মিহিরকুলের রাজ্যলাভ

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাইজেণ্টিন সাম্রাজ্য

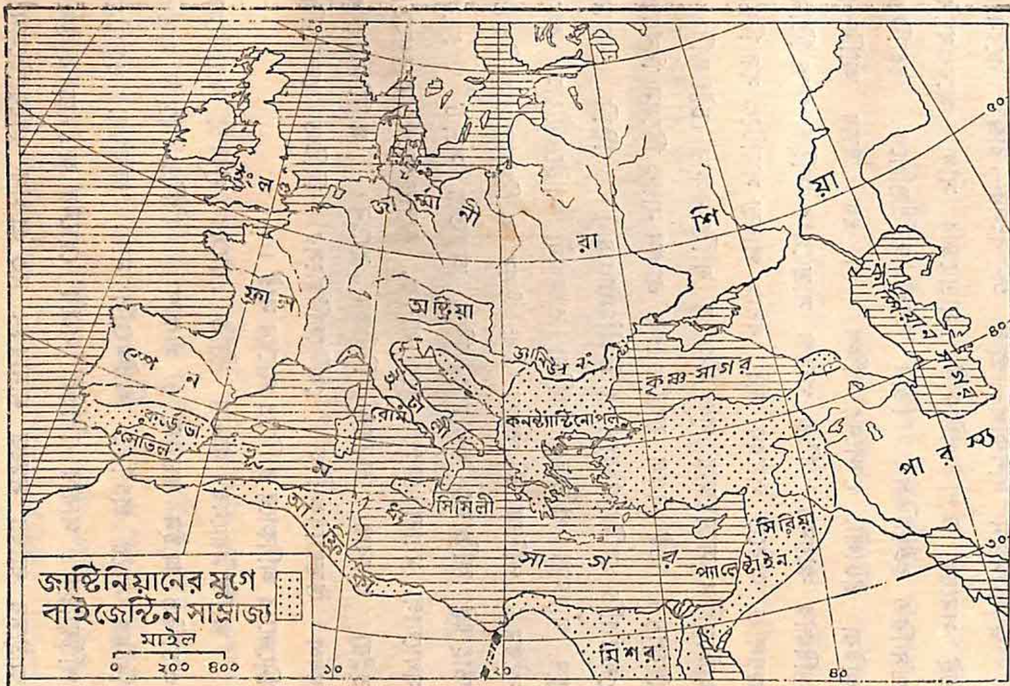
পশ্চিম ইউরোপে রোম সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইলে 'বর্বর' জাতিদের স্থাপিত রাজ্যগুলি তাহার স্থান অধিকার করে। কিন্তু রোম সাম্রাজ্যের পূর্ব ভাগে এইরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই। পূর্ব ইউরোপের বল্কান উপদ্বীপ (বর্তমান তুরস্ক, গ্রীস, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশ), এশিয়ার অন্তর্গত এশিয়া মাইনর ও সিরিয়া, আফ্রিকার অন্তর্গত মিশর প্রভৃতি সমৃদ্ধ অঞ্চল দীর্ঘকাল এক বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার নাম পূর্ব রোম সাম্রাজ্য বা বাইজেন্টিন সাম্রাজ্য। অনেকদিন আগে বাইজেন্টিয়াম (Byzantium) বন্দরে গ্রীকেরা একটি ক্ষুদ্র উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল। পরে রোমের সম্রাট কন্স্ট্যাণ্টাইন (Constantine) সেখানে রোম সাম্রাজ্যের নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার নাম অনুসারে নূতন শহরের নাম হইল কন্স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্। কিন্তু পুরাতন নাম বাইজেন্টিয়াম্ দীর্ঘকাল প্রচলিত ছিল। ক্রমে রোমের সাম্রাজ্য দুই ভাগে ভাগ হইয়া যায়। পশ্চিম ভাগের রাজধানী রহিল রোম, পূর্ব ভাগের রাজধানী হইল বাইজেন্টিয়াম্ বা কন্স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্। রাজধানীর সেই প্রাচীন নাম হইতেই পূর্ব রোম সাম্রাজ্য ইতিহাসে বাইজেন্টিন সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হইয়াছে।

বাইজেন্টিন সাম্রাজ্যের শাসকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন জাস্টিনিয়ান (Justinian)। কৃষকের গৃহে তাঁহার জন্ম হইলেও তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন। সিংহাসন লাভ করিয়া তিনি নানা দিকে সাম্রাজ্যের উন্নতি করেন। রাজকার্যে তিনি এত পরিশ্রম করিতেন যে সাধারণ লোক তাঁহাকে অলৌকিক শক্তির



পুরোহিত ও দেহরক্ষীদের সঙ্গে সম্রাট জাস্টিনিয়ান

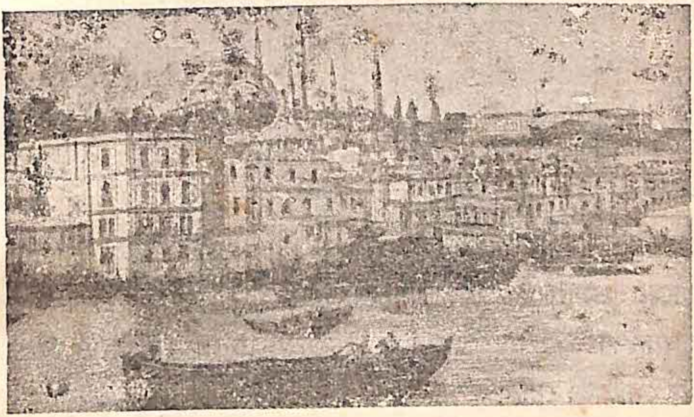
অধিকারী বলিয়া মনে করিত। অনেকের ধারণা ছিল যে রাত্রে তাঁহার ঘুমের প্রয়োজন হইত না, তাঁহার মস্তকহীন দেহ গভীর রাত্রিতে প্রাসাদের বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়াইত। তাঁহার বিদ্যা, বুদ্ধি, কার্যক্ষমতা ও কর্তব্যনিষ্ঠা সেকালের মানুষের মনে বিস্ময় জাগাইত। কিন্তু তাঁহার ব্যবহারে অনেক সময় নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাওয়া যায়। ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার উদারতা ছিল না।


জাষ্টিনিয়ানের যুগে বাইজেন্টিন সাম্রাজ্য
মাইল
০ ২০০ ৪০০
ইংলণ্ড
জার্মানী
রাশিয়া
ফ্রান্স
অষ্ট্রিয়া
স্পেন
কর্ডোভা
টোলেডো
রোম
ইটালী
দানিউব নং
কৃষ্ণ-সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
কনষ্ট্যান্টিনোপল
পারস্য
সিসিলী
আফ্রিকা
সিরিয়া
প্যালেষ্টাইন
মিশর
৫০
৪০
৩০
১০
২০
৪০

জাস্টিনিয়ান দীর্ঘকাল—প্রায় ৩৮ বৎসর—রাজত্ব করেন। এই সময়ের মধ্যে বাইজেন্টিন সাম্রাজ্যের সীমা অনেকখানি প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি 'বর্বর' জাতিগুলিকে পরাজিত করিয়া ইটালী, স্পেনের দক্ষিণ অংশ এবং উত্তর আফ্রিকা অধিকার করেন। কিন্তু পারস্য সাম্রাজ্যের সহিত যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিতে পারেন নাই, বরঞ্চ পারস্য সম্রাটকে কর দিয়া বাইজেন্টিন সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে শান্তি রক্ষার চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সকল যুদ্ধবিগ্রহের প্রধান নায়ক ছিলেন বিখ্যাত সেনাপতি বেলিসেরিয়াস্ (Belisarius)। তিনি একবার হূণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া রাজধানী বাইজেন্টিয়াম্ রক্ষা করেন। পশ্চিম ইউরোপে এবং উত্তর আফ্রিকায় রাজ্যবিস্তার তাঁহারই কৃতিত্বের ফল। কিন্তু অকৃতজ্ঞ সম্রাট তাঁহাকে যথাযোগ্য মর্যাদা দেওয়া দূরে থাকুক, অন্যায় সন্দেহের বশবর্তী হইয়া বারবার তাঁহাকে নির্যাতন করেন। জাস্টিনিয়ানের দুর্বল উত্তরাধিকারীরা বেলিসেরিয়াসের বিজিত দেশগুলি নিজেদের অধিকারে রাখিতে পারেন নাই।

জাস্টিনিয়ানের প্রধান কীর্তি রোমের পূর্ববর্তী সম্রাটদের প্রচারিত আইন সঙ্কলন ও প্রকাশ। বিভিন্ন সম্রাট কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত আইনগুলি নানা জায়গায় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল ; আবার বিভিন্ন সময়ে রোমের আইনজ্ঞ ব্যক্তিরা আইনের ব্যাখ্যা সম্বন্ধে নানারকম মত প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই সকল আইন ও মতামত জাস্টিনিয়ানের নির্দেশে সঙ্কলিত ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি এইভাবে রোমের আইন রক্ষা

করিবার ব্যবস্থা না করিলে হয়তো উহা ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া যাইত। রোমের সাম্রাজ্য আর নাই, কিন্তু পৃথিবীর নানা দেশে এখনও কোন কোন বিষয়ে রোমের আইনের মূল নীতি অনুসরণ করা হয়। তাই আইনের ছাত্রদিগকে এখনও রোমের আইন পড়িতে হয়। রোমের আইন রক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিয়া জাস্টিনিয়ান বর্তমান যুগের মানুষের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।



বাইজেন্টিয়াম্

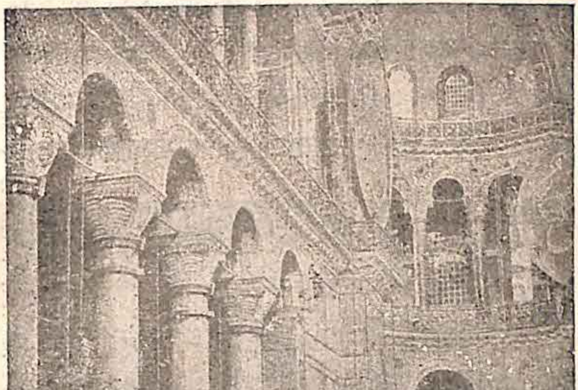
বাইজেন্টিন সাম্রাজ্যের সভ্যতা ও বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল রাজধানী বাইজেন্টিয়াম্। এই সুরক্ষিত নগরের তিন দিকে সমুদ্র, আর উত্তর-পশ্চিম দিকে একটি সুদীর্ঘ ও সুদৃঢ় প্রাচীর। বহিঃশত্রুর পক্ষে বাইজেন্টিয়াম্ অধিকার করা প্রায় অসাধ্য ছিল। সুদূর অ্যাবিসিনিয়া (বা ইথিওপিয়া), সিংহল, ভারত, চীন প্রভৃতি দেশের সহিত বাইজেন্টিয়ামের বাণিজ্য চলিত। অ্যাবিসিনিয়া হইতে বিবিধ পণ্যদ্রব্য আসিত মিশরের মধ্য

দিয়া। ভারত, সিংহল ও চীন হইতে নানারকম জিনিস আসিত লোহিত সাগর ও মিশর অতিক্রম করিয়া। চীন হইতে গুটি-পোকার ডিম আমদানি করা হইত। এইভাবে বাইজেন্টিন সাম্রাজ্যে রেশম শিল্পের প্রচলন হয়। সাম্রাজ্যের উত্তর দিকে রাশিয়ার সহিত বাণিজ্য চলিত। দেশ-বিদেশের সহিত বাণিজ্য হইতে প্রচুর অর্থাগম হইত। সেই অর্থ ব্যয় করা হইত রাজপ্রাসাদের শোভাবর্ধনে এবং রাজসভার জাঁকজমকে।

রাজধানীর উপকণ্ঠে সমুদ্রের উপরে ছিল সম্রাটের প্রাসাদ। প্রাসাদে সোনা, মণি, মাণিক্য এবং চিত্রিত পাথর ও কাঁচের ছড়াছড়ি। সেকালে রাজ-দরবারের শিল্পীরা চাহিত জাঁকজমক —সহজ, সুন্দর জিনিসে তাহাদের তৃপ্তি হইত না। রাজপ্রাসাদে সোনায় তৈরী গাছে সাজানো মণিমাণিক্যের ফুল, সোনার গাছের শাখায় বসানো সোনায় তৈরী পাখী। মানুষের চক্ষু ঝল্‌সাইয়া দিবার আয়োজন চারিদিকেই ছিল। দরবারের বড় বড় লোকেরা সোনা-রূপার কাজ করা বিচিত্র পোষাক পরিতেন। সুকৌশলে নির্মিত নানা রকম বিচিত্র ঘড়ি, খেলনা প্রভৃতি চারিদিকে ছড়াইয়া থাকিত।

জাস্টিনিয়ানের পৃষ্ঠপোষকতায় নানারকম শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। তিনি অনেকগুলি গির্জা নির্মাণ করেন। ইহাদের মধ্যে বাইজেন্টিয়ামের সেন্ট সোফিয়ার গির্জা সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই বিশাল গির্জার নির্মাণকার্যে দশ হাজার লোক পাঁচ বৎসর নিযুক্ত ছিল। ইহার ছাদে ও গম্বুজে বহু চিত্রিত প্রস্তর বসাইয়া অপূর্ব সৌন্দর্য সৃষ্টি করা হইয়াছিল। ইহার মধ্যে প্রবেশ

করিলে মনে হইত যেন চারিদিকে রঙের খেলা চলিতেছে—কোথাও নীল, কোথাও লাল, কোথাও পীত, কোথাও বা সাদা



সেণ্ট সোফিয়ার গির্জার অভ্যন্তর

রঙ ঝকঝক করিতেছে। গম্বুজগুলির গঠন এবং কারুকার্য অতি সুন্দর। পঞ্চদশ শতাব্দীতে তুর্কীরা কন্‌স্ট্যাণ্টিনোপ্‌ল্ অধিকার করিয়া সেণ্ট সোফিয়ার গির্জাকে মসজিদে পরিণত করে।

বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বাইজেন্টিন সম্রাট্‌গণ শক্তিশালী সৈন্যদল ও নৌবাহিনী সুসজ্জিত রাখিতেন। এশিয়া মাইনর এবং আর্মেনিয়া হইতে বহু সৈনিক সংগ্রহ করা হইত। যুদ্ধ-জাহাজ হইতে নলের মধ্য দিয়া শত্রুদের উপর একরকম উষ্ণ তরল পদার্থ নিক্ষেপ করা হইত। ইহাকে "Greek Fire" বলা হয়। বাইজেন্টিন সাম্রাজ্যকে গ্রীক সাম্রাজ্যও বলা হইত।



"Greek Fire"

বোধ হয় সেই জন্যই এই অদ্ভুত অগ্নিবৃষ্টিকে "Greek Fire" নাম দেওয়া হয়। "Greek Fire" ব্যবহার করিয়া বাইজেন্টিন নৌবাহিনী বারবার মুসলমানদের সহিত যুদ্ধে জয়লাভ করে। জাস্টিনিয়ান সাম্রাজ্য সুরক্ষিত করিবার উদ্দেশ্যে বহু দুর্গ ও সেতু নির্মাণ করেন।

বাইজেন্টিয়ামের ভাষা গ্রীক, ধর্ম খ্রীষ্ট ধর্মের একটি বিশিষ্ট রূপ—যাহাকে গ্রীক খ্রীষ্ট ধর্ম (Greek Christianity) বা গোঁড়া খ্রীষ্ট ধর্ম (Orthodox Christianity) বলা হয়।

বাইজেন্টিয়াম্ হইতে গ্রীক খ্রীষ্ট ধর্ম পূর্ব ইউরোপে—বিশেষতঃ রাশিয়ায়—প্রচারিত হয়। বাইজেন্টিন সাম্রাজ্যে নানা দিকে সভ্যতার উন্নতি হইয়াছিল। সম্রাট্‌দের মধ্যে কেহ কেহ সাহিত্য-রসিক বা সাহিত্য ও বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

জাস্টিনিয়ানের মৃত্যুর প্রায় নয় শত বৎসর পরে ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীরা কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্ দখল করে, বাইজেন্টিন সাম্রাজ্য বিলুপ্ত হয়। কিন্তু ইহার কয়েক শত বৎসর আগেই সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইয়াছিল। পারসিক, আরব ও তুর্কীদের সহিত দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, ধর্মসংক্রান্ত মতভেদ এবং সিংহাসনের জন্য কাড়াকাড়ি সাম্রাজ্যকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল। তবু বাইজেন্টিয়াম দীর্ঘকাল মুসলমানদের আক্রমণ হইতে পূর্ব ইউরোপ রক্ষা করে এবং প্রাচীন গ্রীক সাহিত্য ও দর্শনের চর্চা দীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখে। এজন্য ইউরোপ বাইজেন্টিয়ামের নিকট ঋণী রহিয়াছে।

খ্রীষ্টাব্দ

- ৩৩০ কন্‌স্ট্যান্টাইন কর্তৃক বাইজেন্টিয়ামে রাজধানী স্থাপন
- ৩৯৫ রোম সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত: বাইজেন্টিন সাম্রাজ্যের আরম্ভ
- ৪৭৬ পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের বিলোপ
- ৫২৭ জাস্টিনিয়ানের সিংহাসন লাভ
- ৫৬৫ জাস্টিনিয়ানের মৃত্যু
- ১৪৫৩ তুর্কীদের কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্ অধিকার: বাইজেন্টিন সাম্রাজ্যের বিলোপ

তৃতীয় অধ্যায়

ভারত ও চীন

হর্ষবর্ধন

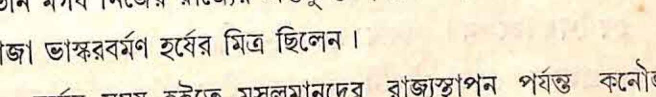
গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় একশত বৎসর পরে হর্ষবর্ধন উত্তর ভারতে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য গঠন করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা পঞ্জাবের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যে রাজত্ব করিতেন। হর্ষ নিজের বাহুবলে উত্তর ভারতের অনেক রাজ্য অধিকার করেন, কিন্তু দাক্ষিণাত্যের চালুক্য রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীকে তিনি পরাজিত করিতে পারেন নাই। পঞ্জাবের পূর্বাঞ্চল, উত্তর প্রদেশ, মগধ এবং উড়িষ্যা হর্ষের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পূর্ব ভারতে আসাম এবং পশ্চিম ভারতে বলভী (বর্তমান সৌরাষ্ট্র) রাজ্য তাঁহার প্রাধান্য স্বীকার করিত।

হর্ষের ভগিনী রাজ্যশ্রীর বিবাহ হইয়াছিল কনৌজের রাজা গ্রহবর্মণের সঙ্গে। হর্ষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্ধনের রাজত্বকালে বাঙ্গালার রাজা শশাঙ্ক ও মালবের রাজা দেবগুপ্ত কনৌজ আক্রমণ করেন। গ্রহবর্মণ নিহত হন, রাজ্যশ্রীকে বন্দিনী করা হয়। অল্পদিন পরে শশাঙ্কের কৌশলে রাজ্যবর্ধন

নিহত হন। রাজ্যবর্ধনের রাজধানী ছিল থানেশ্বর। এই ভাবে কনৌজ ও থানেশ্বর দুই রাজ্যের সিংহাসন শূন্য হয়। তখন দুই রাজ্যের মন্ত্রীরা হর্ষকে রাজা বলিয়া মানিয়া লইলেন। তিনি কনৌজে রাজধানী স্থাপন করিলেন। রাজ্যশ্রীর সন্ধান লইয়া জানা গেল, তিনি কোন রকমে শত্রুদের হাত হইতে মুক্ত হইয়া বিন্ধ্য পর্বতের জঙ্গলে আশ্রয় লইয়াছেন। সেখান হইতে হর্ষ তাঁহাকে উদ্ধার করিলেন।

ইহার পর শশাঙ্কের সহিত হর্ষের যুদ্ধ হয়। বোধ হয় হর্ষ শশাঙ্ককে পরাজিত করিতে পারেন নাই। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর তিনি মগধ নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। কামরূপ বা আসামের রাজা ভাস্করবর্মণ হর্ষের মিত্র ছিলেন।

হর্ষের সময় হইতে মুসলমানদের রাজ্যস্থাপন পর্যন্ত কনৌজ ছিল উত্তর ভারতের প্রধান নগর। শহরটি হর্ষের সময়ে দৈর্ঘ্যে ৪ মাইল এবং প্রস্থে এক মাইলের বেশী ছিল। শহরের চারিদিকে একটি পরিখা। পরিখার পাশে পাশে এখানে-



হর্ষবর্ধনের স্বাক্ষর (স্বহস্তো মম মহারাজাধিরাজ শ্রীহর্ষস্য)

ওখানে বড় বড় স্তম্ভ। শহরের বিভিন্ন অংশে বড় বড় পুষ্করিণী, ফুলের বাগান ও উপবন। ধর্মার্থীদের জন্য দুইশত দেবমন্দির

আর একশত বৌদ্ধমঠ। ইহা ছাড়া রাজার প্রাসাদ, ধনীদের বড় বড় বাড়ী। শহরের লোকেরা বেশ সুখেস্বচ্ছন্দে বাস করিত, রেশমের পোষাক এবং দামী কাপড় পরিত। নানা দেশ হইতে নানারকম জিনিস কনৌজে আসিত। বিদ্যাচর্চার জন্য কনৌজের খুব খ্যাতি ছিল।

হর্ষের সভাপণ্ডিত বাণভট্ট তাঁহার জীবনী লিখিয়াছেন। এই বইয়ের নাম 'হর্ষচরিত'। বাণভট্টের লেখা 'কাদম্বরী' সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। হর্ষ নিজেও সাহিত্যিক ছিলেন। তাঁহার লেখা তিনখানি সংস্কৃত নাটক—'রত্নাবলী', 'নাগানন্দ', 'প্রিয়দর্শিকা'—এখনও আছে।

হর্ষ শৈব ছিলেন। বোধ হয় চীনদেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের প্রভাবে শেষ জীবনে তাঁহার বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছিল। একবার তিনি কনৌজে এক বিরাট ধর্মমহাসভার অনুষ্ঠান করেন। আঠার দিন ধরিয়া এই উৎসব চলিয়াছিল। এখানে কয়েক হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ব্রাহ্মণ ও জৈন সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন; ইহা ছাড়া আঠার জন রাজা এবং দেশের গণ্যমান্য বহু লোক আসিয়াছিলেন। বুদ্ধের স্বর্ণপ্রতিমা সহ এক বিরাট শোভাযাত্রা বাহির হইল। শোভাযাত্রার শেষে হর্ষ স্বয়ং বিবিধ বস্ত্র ও অলঙ্কার দিয়া ঐ প্রতিমার পূজা করিলেন। পূজার পর ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ হয় এবং হর্ষ মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন।

প্রয়াগে (বর্তমান এলাহাবাদে) হর্ষ প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তর একটি দান-মহোৎসব করিতেন। গঙ্গা-যমুনা সঙ্গমের পশ্চিমে

"আয়নার মত সমতল" এক বিরাট প্রাঙ্গণে এই মহোৎসব হইত। হর্ষের আদেশে সারা দেশের শ্রমণ, সন্ন্যাসী, গরীব, অনাথ, আতুর প্রভৃতি দান গ্রহণের জন্য এখানে উপস্থিত হইত। একবার আড়াই মাস বিভিন্ন শ্রেণীর বহু লোককে অর্থ ও নানারকম জিনিস দান করিবার পর হর্ষের নিজের বস্ত্র ও অলঙ্কার পর্যন্ত ফুরাইয়া গেল। তখন তিনি রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে একখানি পুরাতন বস্ত্র চাহিয়া লইলেন এবং তাহা পরিয়া বুদ্ধপূজা করিলেন। পৃথিবীর আর কোন দেশে কোন রাজা এইভাবে সর্বস্ব দান করিয়া নিজেকে একেবারে রিক্ত করেন নাই।

হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে কনৌজ উত্তর ভারতে পাটলিপুত্রের স্থান অধিকার করিয়াছিল। হিউয়েন সাঙ্ বলিয়াছিলেন, শহরটি দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল এবং প্রস্থে ১¼ মাইল ছিল। বহু বৌদ্ধ মঠ ও হিন্দু দেবদেবীর মন্দির কনৌজের শোভাবর্ধন করিত।

হিউয়েন সাঙ্

কনৌজের ঐশ্বর্য এবং হর্ষের দানশীলতা সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহা চীন দেশীয় পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙের লেখা হইতে লওয়া হইয়াছে। তিনি বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার জন্য সুদূর চীন হইতে বহু দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া এবং বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এদেশে আসিয়াছিলেন।

চীনের এক শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে হিউয়েন সাঙের জন্ম হয়। মাত্র বার বৎসর বয়সে তিনি এক বৌদ্ধমঠে ভিক্ষু রূপে প্রবেশ করেন। বৌদ্ধদের ধর্মশাস্ত্র ভাল করিয়া পড়িবার জন্য তিনি ভারতবর্ষে আসিবার সঙ্কল্প করেন। তখন সরকারী অনুমতি ছাড়া চীনের লোক বিদেশে যাইতে পারিত না। হিউয়েন সাঙ্ সরকারী অনুমতি পাইলেন না। সরকারী নির্যাতনের ভয় উপেক্ষা করিয়া তিনি আটাশ বৎসর বয়সে বুদ্ধের পবিত্র জন্মভূমির দিকে যাত্রা করিলেন।

চীনের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া হিউয়েন সাঙ্ বিশাল গোবি মরুভূমি এবং তুষারাবৃত তিয়েন-শান পর্বতমালা পার হইলেন। তারপর তিনি মধ্য এশিয়ায় তুরস্ক সম্রাটের রাজ্যে পৌঁছিলেন। সেখানে ভোজের সময় সম্রাটের অনুরোধে তিনি সৈন্যদলের প্রধানদের সম্মুখে বৌদ্ধ ধর্মের মূল কথাগুলি ব্যাখ্যা করিলেন। তাঁহার উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া সম্রাট্ বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী হইলেন এবং ভারতের পথে হিউয়েন সাঙের যেন কোনরকম কষ্ট বা অসুবিধা না হয় তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

কিছুদিন পরে হিউয়েন সাঙ্ মধ্য এশিয়ার প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র সমরকন্দে পৌঁছিলেন। ক্রমশঃ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে হইতে তিনি বর্তমান আফগানিস্তানের উত্তর ভাগে বাল্খ্ প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। এখানে হিউয়েন সাঙ্ একশত বৌদ্ধ মঠ এবং তিন হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখিতে পান। বাল্খের পরে হিন্দুকুশ পর্বত—তার পরে ভারতবর্ষের অন্তর্গত গান্ধার।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে হিউয়েন সাঙ হূণদের অত্যাচারের

অনেক চিহ্ন দেখিয়াছিলেন। ঐ অঞ্চলে তখন বহু বিধ্বস্ত নগর, মন্দির ও বৌদ্ধমঠের ধ্বংসাবশেষ দেখা যাইত। হর্ষের সাম্রাজ্য ওদিকে প্রসারিত হয় নাই।

কাশ্মীর ও পঞ্জাব অতিক্রম করিয়া হিউয়েন সাঙ্ ক্রমে ক্রমে উত্তর ভারতের প্রধান নগরগুলি দেখিতে লাগিলেন। মথুরা, থানেশ্বর, কনৌজ, অযোধ্যা, প্রয়াগ, কৌশাম্বী, বুদ্ধগয়া, নালন্দা প্রভৃতি সেকালের প্রসিদ্ধ স্থানগুলির সুন্দর বর্ণনা তাঁহার লেখায় পাওয়া যায়। ইহার পর বাঙ্গালা ও কামরূপ (আসাম) ভ্রমণ করিয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে গেলেন। উত্তর বাঙ্গালায় পুণ্ড্রবর্ধন, পশ্চিম বাঙ্গালায় কর্ণসুবর্ণ (শশাঙ্কের রাজধানী) এবং দক্ষিণ বাঙ্গালায় তাম্রলিপ্তি (বর্তমান তমলুক) তখন সমৃদ্ধ নগর ছিল।

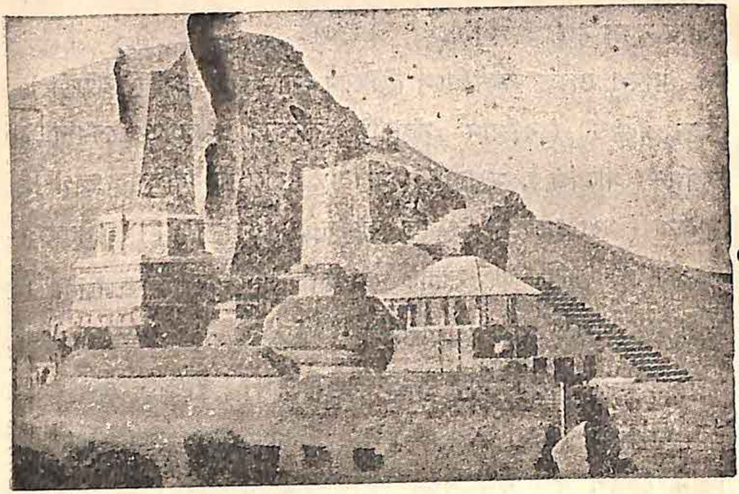
দক্ষিণ ভারত ভ্রমণকালে হিউয়েন সাঙ্ কলিঙ্গ (উড়িষ্যা), অন্ধ্র, বিদর্ভ (বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের অন্তর্গত বেরার), কর্ণাট (মাদ্রাজ), মহারাষ্ট্র (মহারাষ্ট্র রাজ্যের দক্ষিণ ভাগ), মালব (মধ্য প্রদেশ) প্রভৃতি অঞ্চল দেখিয়াছিলেন। সিংহলে গৃহযুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষের সংবাদ পাইয়া তিনি সেখানে যান নাই। পশ্চিম ভারতে তিনি বলভী (গুজরাট রাজ্যের অন্তর্গত সৌরাষ্ট্র), মূলতান ও সিন্ধু পর্যন্ত গিয়াছিলেন।

প্রায় চৌদ্দ বৎসরে হিউয়েন সাঙ্ ভারত ভ্রমণ শেষ করেন। তিনি কেবল বড় বড় শহর ও বৌদ্ধ মঠের বর্ণনা দিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। দেশের সাধারণ মানুষ কি খাইত পরিত, তাহাদের স্বভাবচরিত্র কেমন ছিল, এ সকল কথাও বলিয়াছেন। তিনি

সম্রাট্ হর্ষের বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। এদেশ হইতে বৌদ্ধ ধর্ম সংক্রান্ত বহু মূর্তি ও বই তিনি হাতী ও ঘোড়ার পিঠে চাপাইয়া চীন দেশে লইয়া যান। স্বদেশে ফিরিয়া তিনি চীনের সম্রাটের কাছে সাদর অভ্যর্থনা পাইলেন। ইহার পর হিউয়েন সাঙ্ যতদিন বাঁচিয়া ছিলেন তাঁহার প্রধান কাজ ছিল ভারত হইতে লওয়া সংস্কৃত বইগুলির চীনা ভাষায় অনুবাদ করা।

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়

হর্ষবর্ধনের যুগে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় এশিয়ার একটি প্রধান শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। মগধের পুরাতন রাজধানী রাজগৃহের



নালন্দার প্রধান মঠের ধ্বংসাবশেষ

(বর্তমান বিহারের অন্তর্গত রাজগির) সাত মাইল উত্তরে এই

বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। হিউয়েন সাঙ্ বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য দুই বৎসর নালন্দায় শিক্ষা গ্রহণ করেন। নালন্দার ধ্বংসাবশেষ লোকে এখনও দেখিতে যায়।

বুদ্ধের জন্মের কিছুকাল পরে নালন্দায় একটি বৌদ্ধ মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার পর গুপ্তবংশীয় চারিজন সম্রাট্ এখানে চারিটি বৌদ্ধমঠ নির্মাণ করেন। মধ্য ভারতের এক রাজা আরও একটি বৌদ্ধমঠ প্রতিষ্ঠা করেন। এই ছয়টি মঠ ঘিরিয়া একটি উচ্চ ইটের প্রাচীর হিউয়েন সাঙের সময়ে বর্তমান ছিল। ভিতরে ঢুকিবার জন্য কেবলমাত্র একটি তোরণ ছিল। এই মঠগুলি লইয়াই বিশ্ববিদ্যালয়, এখানেই অধ্যয়ন অধ্যাপনা চলিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজাদের দেওয়া একশত খানি গ্রাম ছিল। এই সকল গ্রামের অধিবাসীরা প্রত্যহ কয়েক শত মণ চাউল, ঘি ও দুধ জোগাইত। তাহাতেই অধ্যাপক ও ছাত্রদের সকল প্রয়োজন মিটিত।

হিউয়েন সাঙের সময়ে নালন্দায় দশ হাজার বিদ্যার্থী বাস করিত। তাহারা যে কেবল বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্র পড়িত তাহা নয়; বেদ, ব্যাকরণ, হিন্দু দর্শন, চিকিৎসা বিদ্যা প্রভৃতিও পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। শিক্ষকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন শীলভদ্র। ইনি বাঙালী, সমতটের (পূর্ব বঙ্গ) রাজপরিবারের লোক। এই জ্ঞানবৃদ্ধ তপস্বীর নিকট হিউয়েন সাঙ্ শিক্ষালাভ করেন।

প্রত্যহ মঠগুলির মধ্যে একশত স্থানে অধ্যাপনা চলিত। সমস্ত দিন সকাল হইতে রাত্রি পর্যন্ত নানা বিষয়ের আলোচনা

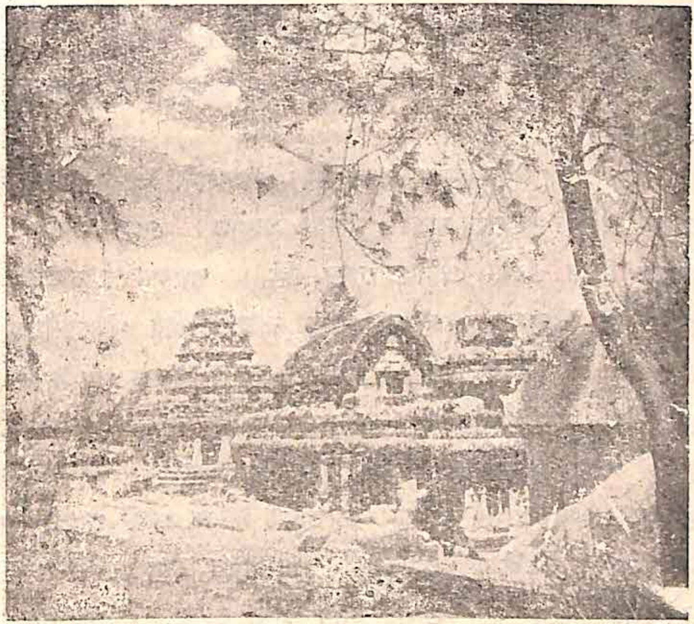
ও বিচার হইত। ছাত্রেরা মঠের মধ্যেই বাস করিত। তাহারা বিনা বেতনে পড়িত, আহার এবং বাসস্থানের জন্যও তাহাদিগকে খরচ দিতে হইত না। কিন্তু তাহাদিগকে কঠোর নিয়ম মানিয়া চলিতে হইত। হিউয়েন সাঙ্ বলিয়াছেন, এই সঙ্ঘারামের প্রতিষ্ঠা হইতে সাত শত বৎসরের মধ্যে কেহ কখনও ইহার নিয়ম ভঙ্গ করে নাই।

নালন্দার খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। বিদেশী পণ্ডিতেরা নিজেদের সন্দেহ দূর করিবার জন্য এখানে আসিতেন। অনুপযুক্ত ছাত্রকে এখানে ভর্তি করা হইত না। কেহ মঠে প্রবেশ করিতে চাহিলে দ্বারপাল তাহাকে কতকগুলি কঠিন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিত। যে উত্তর দিতে না পারিত তাহাকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। হিউয়েন সাঙ্ বলিয়াছেন, সাধারণতঃ শতকরা ৮০।৯০ জনই প্রবেশের অধিকার পাইত না। কেহ কেহ নিজেকে নালন্দার ছাত্র বলিয়া মিথ্যা পরিচয় দিয়া সম্মানলাভের চেষ্টা করিত। হিউয়েন সাঙের লেখায় নালন্দার কয়েকজন প্রধান পণ্ডিতের নাম পাওয়া যায়। ইহারা বৌদ্ধ ধর্ম সম্বন্ধে অনেক বই লিখিয়াছিলেন এবং পরে চীনা ভাষায় সেগুলির অনুবাদ করা হইয়াছিল।

দক্ষিণ ভারত

হিউয়েন সাঙ্ দক্ষিণ ভারতে মহারাষ্ট্র দেশের চালুক্যবংশীয় রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যে গিয়াছিলেন। তিনি পরাক্রান্ত

রাজা ছিলেন ; স্বয়ং হর্ষবর্ধনও তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। হিউয়েন সাঙ্ বলিয়াছিলেন, পুলকেশীর ধর্মমত উদার, কিন্তু তিনি যুদ্ধ ভালবাসেন এবং যুদ্ধে গৌরবলাভ জীবনের



পল্লবদের নির্মিত 'রথ'

প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে করেন। তাঁহার রাজ্যে সামরিক নিয়মকানুন কঠোরভাবে পালন করা হয় এবং পদাতিক ও অশ্বারোহীদের সাজ-সজ্জার উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। নর্মদা হইতে কাবেরী পর্যন্ত তাঁহার অধিকার প্রসারিত

হইয়াছিল। বাতাপি (বর্তমান মহারাষ্ট্র রাজ্যের বিজাপুর জেলার অন্তর্গত বাদামি) তাঁহার রাজধানী ছিল। বাতাপির কাছে চালুক্য রাজারা কতকগুলি গুহা-মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। এই সকল মন্দিরে পাথরে তৈরী ও খোদাই করা অনেকগুলি সুন্দর দেবমূর্তি আছে। গুহা-মন্দির ও মূর্তিগুলি দেখিলে বোঝা যায় সেকালে শিল্পের কতখানি উন্নতি হইয়াছিল।

চালুক্য-রাজ্যের দক্ষিণে পল্লব-রাজ্য, রাজধানী কাঞ্চী। এই প্রাচীন শহরটি বর্তমানে মাদ্রাজ রাজ্যের অন্তর্গত। সেকালে কাঞ্চী সংস্কৃত চর্চার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। পল্লববংশীয় রাজারা পরাক্রান্ত ছিলেন। একজন পল্লব রাজা দ্বিতীয় পুলকেশীকে পরাজিত ও নিহত করেন। পল্লব-রাজ্যে শিল্পের খুব উন্নতি হইয়াছিল। মহাবলীপুরম্ (বর্তমান নাম মামল্লপুরম্) নামক স্থানে পল্লব রাজাদের নির্মিত কয়েকটি অপূর্ব মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলিকে 'রথ' বলে। প্রত্যেকটি মন্দির একটি পাহাড়ের টুকরা কাটিয়া তৈরী করা হইয়াছে। পঞ্চপাণ্ডব এবং পাণ্ডব-পত্নী দ্রৌপদীর নামে মন্দিরগুলির নাম রাখা হইয়াছে ('ভীম-রথ', 'দ্রৌপদী-রথ' ইত্যাদি)। মন্দিরগুলির কারুকার্য অতি চমৎকার।

চীন

হিউয়েন সাঙের যুগে চীন দেশ তাঙ্ বংশীয় সম্রাট্‌দের অধীন ছিল। তাঙ্ বংশের রাজত্বকাল চীনের ইতিহাসে এক প্রসিদ্ধ যুগ।

চীন দেশে হর্ষবর্ধনের সমসাময়িক সম্রাট ছিলেন তাই সুঙ্। তিনি দুর্দান্ত তাতার আক্রমণকারীদিগকে তাড়াইয়া দিয়া দেশে শান্তি ও ঐক্য স্থাপন করেন। দার্শনিক কন্‌ফুসিয়াসের লেখা বইগুলি তিনি শ্রদ্ধার সহিত পড়িতেন। তাঁহার উদ্দেশে তিনি একটি মন্দির নির্মাণ করেন। কঠোর আইন-কানুনের সাহায্যে শাসন করা তিনি পছন্দ করিতেন না। সকল ধর্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। তিনি খ্রীষ্টান ও পারসিকদিগকে চীন দেশে নিজ নিজ ধর্ম প্রচারের অনুমতি দেন। তাঁহার অনুমতি লইয়া মুসলমানেরা একটি মসজিদ নির্মাণ করে।

তাই সুঙের রাজত্বকালে চীনে যে সুশাসনের যুগ আরম্ভ হয় তাহা বহুদিন চলিয়াছিল। এই যুগের আর একজন প্রসিদ্ধ সম্রাটের নাম মিঙ্ হুয়াঙ্। শেষ জীবনে তিনি তাতারদের কাছে পরাজিত হইয়া সিংহাসন হারাইয়াছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহে ব্যস্ত থাকিলেও প্রজাদের মঙ্গলের দিকে তাঁহার দৃষ্টি ছিল। তিনি মৃত্যুদণ্ডদানের প্রথা বাতিল করেন এবং আদালত ও কারাগারের সংস্কার করেন।

তাঙ্ বংশের রাজত্বকালে চীনের সাধারণ লোকের অবস্থা মোটামুটি ভালই ছিল। বাণিজ্য হইতে অনেকের প্রচুর আয় হইত। বিলাসিতায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করা হইত।

তখন চীনে বৌদ্ধ ধর্মের যথেষ্ট প্রসার হইয়াছিল, কিন্তু পাশাপাশি কন্‌ফুসিয়াস্ এবং লাউৎসের মতও প্রচলিত ছিল। সাহিত্য ও শিল্পের সমাদর ছিল। তাই সুঙ্ জ্যোতিষ শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার লেখা কয়েকখানি বই এখনও

আছে। মিঙ্ হুয়াঙ্ নিজে কবিতা লিখিতেন। কবি ও চিত্রকরগণকে উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করিবার রীতি ছিল। শিল্পের মধ্যে চিত্রাঙ্কন, মাটির চিত্রিত বাসন নির্মাণ, মণিমুক্তা-খচিত অলঙ্কার তৈরী প্রভৃতি প্রধান ছিল। বিজ্ঞান চর্চার প্রতিও দৃষ্টি ছিল। চীন দেশে বারুদের আবিষ্কার হইয়াছিল।

মিঙ্ হুয়াঙের রাজত্বকালে চীনের প্রধান কবি ছিলেন লি পো। তিনি নাকি দশ বৎসর বয়সে কন্‌ফুসিয়াসের লেখা সবগুলি বই পড়িয়া ফেলিয়াছিলেন।

খ্রীষ্টাব্দ

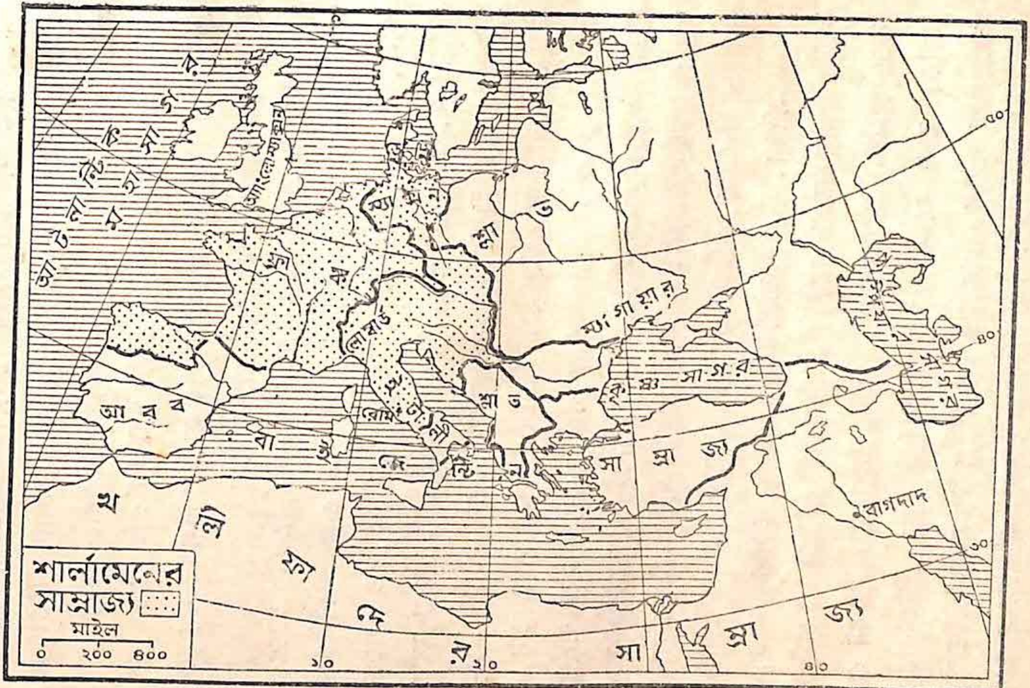
—৬০১ হিউয়েন সাঙের জন্ম
—৬০৬ হর্ষবর্ধনের রাজ্যলাভ
—৬০৯ দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজ্যলাভ
—৬২৭ তাই সুঙের রাজ্যলাভ
—৬২৯ হিউয়েন সাঙের ভারত যাত্রা
—৬৩০ হিউয়েন সাঙের ভারতে আগমন
—৬৪২ দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যু
—৬৪৩ হিউয়েন সাঙের ভারত ত্যাগ
—৬৪১ (বা ৬৪৭) হর্ষবর্ধনের মৃত্যু
—৬৫০ তাই সুঙের মৃত্যু
—৭১৩ মিঙ্ হুয়াঙের রাজ্যলাভ
—৭৫৬ মিঙ্ হুয়াঙের রাজ্যচ্যুতি

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের বাহিরে ভারতীয় সভ্যতা

অতি প্রাচীন কালে ভারতের সহিত পৃথিবীর নানা দেশের যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। হরপ্পা এবং মোহেঞ্জোদড়োর লোকেরা ভারতের বাহিরের কোন দেশ হইতে এদেশে আসিয়াছিল। এদেশে আসিবার পরেও তাহারা পশ্চিম এশিয়ার সভ্য জাতিগুলির সহিত যোগাযোগ রাখিত। পারসিক সম্রাটদের আমলে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সহিত পারস্যের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের ফলে পশ্চিম এশিয়া ও গ্রীসের সহিত ভারতের সংযোগ স্থাপিত হয়। অশোক ঐ সকল দেশে ধর্মপ্রচারক পাঠাইয়াছিলেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে নানারকম রাজনৈতিক পরিবর্তন হইলেও ভারতবর্ষ পৃথিবীর অন্যান্য দেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই। খ্রীষ্টজন্মের পরে দীর্ঘকাল রোম সাম্রাজ্য, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীনের সহিত ভারতের বাণিজ্য চলিত। বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ধর্মপ্রচারও চলিত। সেকালে শুধু ভারতের পণ্যদ্রব্য বিদেশে যায় নাই, ভারতের ধর্মও বিদেশে প্রচারিত হইয়াছিল। আবার ভারতের বহু লোক বাণিজ্য ও ধর্মপ্রচার উপলক্ষে বিদেশে যাইয়া সেইখানেই স্থায়ী ভাবে বাস করিতে লাগিল। এইভাবে মধ্য এশিয়ায় এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে ভারতীয়


শার্লামেনের
সাম্রাজ্য
মাইল
০ ২০০ ৪০০
আটলান্টিক মহাসাগর
আংলোস্যাক্সন
আরব
লোম্বার্ড
রোম
ম্যাগায়ার
স্লাভ
কৃষ্ণ সাগর
বাগদাদ
সাম্রাজ্য

রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার রাজত্বকালে জার্মানীর এক বৃহৎ অংশে নূতন সভ্যতার যুগ আরম্ভ হয়।

শার্লামেনের খ্যাতি কেবল ইউরোপে নয়, ইউরোপের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। খলিফা হারুণ অল-রশীদ তাঁহার রাজসভায় দূত পাঠাইয়াছিলেন। খলিফার নিকট হইতে যে সকল উপহার আসিয়াছিল তাহার মধ্যে ছিল একটি ঘড়ি ও একটি হাতী। সেকালের ফ্রাঙ্কদের কাছে ঘড়ি ও হাতীর খুব সমাদর হইয়াছিল।

খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু পোপ রোমে বাস করিতেন। রোমে তখন সম্রাট নাই, ইটালীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রাজার অধিকার। উত্তর ইটালীর লোম্বার্ড জাতি (Lombards) পোপের শত্রু। লোম্বার্ডদের শত্রুতা হইতে পোপকে রক্ষা করিলেন শার্লামেন। তিনি লোম্বার্ডদের রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। রোমেও পোপের শত্রু ছিল। শার্লামেন তাহাদের অত্যাচার হইতে পোপকে রক্ষা করিলেন। কৃতজ্ঞ পোপ তাঁহাকে রোমের সম্রাট রূপে অভিষেক করিলেন। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টমাস পর্বের সময় শার্লামেন রোমে সেন্ট পিটারের গির্জায় হাঁটু গাড়িয়া উপাসনা করিতেছিলেন। হঠাৎ পোপ তাঁহার মস্তকে সোনার মুকুট পরাইয়া দিলেন। গির্জায় উপস্থিত জনসাধারণ নূতন সম্রাটের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। পোপ যে এইভাবে তাঁহাকে সম্রাটের মুকুট পরাইয়া দিবেন তাহা শার্লামেন আগে জানিতে পারেন নাই।

শার্লামেনের অভিষেক ইউরোপের ইতিহাসে একটি বিশেষ

মত প্রচলিত ছিল। কেবল ধর্মে নহে, ভাষায় এবং শিল্পেও ঐ সকল দেশে ভারতীয় প্রভাব সুস্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়।



দীপঙ্কর অতীশ

বর্তমান ইন্দো-চীন দেশে প্রাচীন কালে 'কম্বুজ' নামে একটি হিন্দু-রাজ্য ছিল। এক সময়ে ইন্দো-চীন, শ্যাম এবং ব্রহ্মদেশের ও মালয়ের খানিকটা এই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহার রাজধানী যশোধরপুর (বর্তমান আঙ্কোর থোম) আকারে ও সৌন্দর্যে সেকালের একটি প্রধান নগর। শহরটি চতুষ্কোণ, প্রত্যেকটি দিকের দৈর্ঘ্য দুই মাইলের বেশী। শত্রুর আক্রমণ রোধ করিবার জন্য চতুর্দিকে একটি প্রশস্ত পরিখা এবং একটি উঁচু প্রাচীর। শহরের মধ্যস্থলে প্রসিদ্ধ বেয়ন মন্দির। ইহা আকৃতিতে পিরামিডের মত; তিনটি স্তর পর পর সাজাইয়া মন্দিরটি গড়া হইয়াছে। প্রায় চল্লিশটি মিনার মন্দিরের উপরে মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।—প্রত্যেকটির মাথায় চারিদিকে ধ্যানী শিবের মূর্তি খোদাই করা। মন্দিরের চারিদিকে আরও কয়েকটি বড় বড় মন্দির ও প্রাসাদ। শহরের তোরণগুলি দেখিতে অতি সুন্দর—উপরে মিনার, নীচে প্রহরীদের গৃহ। বিভিন্ন

তোরণ হইতে পাঁচটি প্রশস্ত রাজপথ শহরের কেন্দ্রস্থলে চলিয়া গিয়াছে। শহরে অনেক বড় বড় ঘাট-বাঁধানো পুকুর। রাজপথে সুন্দরভাবে সাজানো রথ, বড় বড় হাতী।



আঙ্‌কোর ভাট

কম্বুজ রাজ্যে শিবের পূজা প্রচলিত ছিল, সংস্কৃত ভাষার খুব সমাদর ছিল। এখানে অনেক ব্রাহ্মণ বাস করিত। জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত থাকিলেও বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ চলিত।

কম্বুজ রাজ্যের আর একটি প্রধান শিল্পকীর্তি 'আঙ্‌কোর ভাট' নামে পরিচিত প্রসিদ্ধ বিষ্ণুমন্দির। পরপর তিনটি সমতল ছাদ (terrace) অতিক্রম করিয়া প্রধান মন্দিরে উঠিতে হয়। প্রধান মন্দিরের উপরে একটি উঁচু মিনার—নীচে চারিদিকে আরও অনেক মিনার রহিয়াছে। ছাদগুলির গায়ে নানারকম মূর্তি খোদাই করা। মন্দিরের চারিদিকে একটি সুদীর্ঘ পাথরের প্রাচীর, প্রাচীরের বাহিরে একটি পরিখা। আকৃতিতে, গঠন-কৌশলে ও কারুকার্যে এই মন্দিরের তুলনা পাওয়া কঠিন।

বর্তমান আনাম দেশে আর একটি হিন্দু-রাজ্য ছিল; তাহার নাম চম্পা। এই রাজ্যে অনেক বড় বড় শহর ও মন্দির ছিল। হিন্দু ও বৌদ্ধ—দুই সম্প্রদায়ের লোকই মন্দির নির্মাণ করিত।

মালয় এবং ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে বিশাল শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এক সময়ে মালব, সুমাত্রা, যাভা, বলি ও বোর্ণিও এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সেকালে আরব বণিকেরা এই অঞ্চলে বাণিজ্য করিত। তাহারা শৈলেন্দ্ররাজগণের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল। কয়েকজন আরব লেখক বলিয়াছেন, শৈলেন্দ্র রাজা প্রতিদিন সোনার তৈরী একখানি ইট হ্রদের জলে ফেলিয়া দিতেন। তিনি দৈনিক যে রাজস্ব পাইতেন তাহার পরিমাণ ২০০ মণ সোনা। তাই আরবদের মনে হইত যে এই রাজার চেয়ে বেশী ধনী বা ক্ষমতাশালী রাজা পৃথিবীতে আর নাই।

শৈলেন্দ্র রাজারা মহাযানী বৌদ্ধ ছিলেন। বাঙ্গালা দেশের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। একজন শৈলেন্দ্র রাজা নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা মঠ নির্মাণ করেন। কুমারঘোষ নামক এক বাঙ্গালী পণ্ডিত শৈলেন্দ্র রাজবংশের গুরু ছিলেন। শৈলেন্দ্র-সাম্রাজ্যের অন্তর্গত যাভায় রামায়ণ ও মহাভারতের যথেষ্ট সমাদর ছিল। এই দ্বীপে এখনও রাম-লক্ষ্মণ ও পঞ্চ-পাণ্ডবের কাহিনী সুপ্রচলিত।

শৈলেন্দ্র রাজাদের নির্মিত বরবুদূর স্তূপ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার এক বিরাট শিল্পকীর্তি। ইহা একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। পরপর নয়টি সমতল ছাদ (terrace) পাহাড়ের উপরে সাজানো

হইয়াছে—তাহার উপরে বৃহৎ স্তূপ, দেখিতে একটি বিশাল ঘণ্টার মত। এখানে ওখানে ছোট ছোট স্তূপ, অসংখ্য বুদ্ধমূর্তি, বৌদ্ধধর্মশাস্ত্রের নানারকম কাহিনী ছবির মত খোদাই করা। বরবুদূরের মত বিশাল ও অপূর্ব সৌন্দর্যে ভূষিত স্তূপ ভারতবর্ষে বা অন্য কোন দেশে নাই।



বরবুদূর

শ্যাম, ব্রহ্মদেশ এবং সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। শ্যামে একটি রাজ্যের নাম ছিল অযোধ্যা। এখানে পালি ভাষার প্রচলন ছিল। বহু ভারতীয় ব্রহ্মদেশে যাইয়া স্থায়ী বসতি স্থাপন করে। অশোকের ভ্রাতা (বা পুত্র) মহেন্দ্র এবং কন্যা সঙ্ঘমিত্রা সিংহলে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। সিংহলের এক রাজা গুপ্তবংশীয় সম্রাট সমুদ্রগুপ্তের প্রভাব স্বীকার করেন। এই সকল দেশে ভারতীয় রীতি ও আদর্শ অনুসারে বহু মন্দির নির্মাণ করা হইয়াছিল।

উপরে যাহা বলা হইল তাহা পড়িলে তোমরা বুঝিতে পারিবে যে ভারতবর্ষ হইতে এশিয়ার নানা দেশে ধর্ম, ভাষা ও শিল্পরীতি প্রচারিত হইয়াছিল। এখনও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে সাধারণ মানুষের কথাবার্তায় ও আচার-ব্যবহারে ভারতের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ভারতের মত সভ্যতার আর একটি কেন্দ্র ছিল চীন। চীনের সভ্যতা কোরিয়া, জাপান, ইন্দো-চীন প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। ভারত ও চীনের সভ্যতা সমগ্র পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়াকে যেন এক সূত্রে গাঁথিয়া ফেলিয়াছিল।

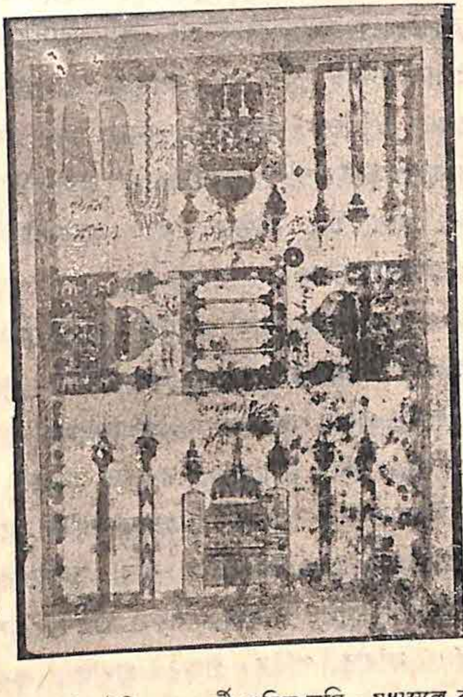
পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামের কাহিনী

যীশু খ্রীষ্টের জন্মের ছয় শত বৎসর পরে আরব দেশে এক নূতন ধর্মের অভ্যুদয় ঘটে। তখন উত্তর ভারতে হর্ষবর্ধনের রাজত্ব চলিতেছে। এই ধর্মের নাম ইসলাম। আরবের নবী (Prophet) মহম্মদ কর্তৃক এই ধর্ম প্রচারিত হয়। যে অঞ্চলে ইহুদীদের ধর্ম এবং খ্রীষ্ট ধর্মের উৎপত্তি হইয়াছিল তাহা ইসলামের উৎপত্তিস্থান হইতে বেশী দূরে নহে। এই তিনটি ধর্মের মধ্যে নানা বিষয়ে সাদৃশ্য আছে।

প্রাচীন আরব

আরব মরুভূমির দেশ। মরুভূমিতে এখানে সেখানে কতকগুলি মরূদ্যান, দুই চারিটি শহর। দেশটি আকারে বেশ বড়, কিন্তু চাষের উপযুক্ত জমি খুব কম।



মক্কায় পরিবেষ্টনীর মধ্যবর্তী পবিত্র ভূমি—মধ্যস্থলে কাবা

আরবের এক দিকে মিশর, আর এক দিকে ব্যাবিলনিয়া। এই দুই দেশের প্রাচীন সভ্যতার প্রভাব আরবেও পৌঁছিয়াছিল। ইহুদীদের সহিত আরবদের নানা বিষয়ে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল।

অ্যাসীরিয়ার সহিত আরবের যোগাযোগ ছিল। কিন্তু মহম্মদের জন্মকালে আরবের সভ্যতা অতি নিম্ন স্তরে নামিয়া গিয়াছিল।

আরব দেশের অধিবাসীদের এক শ্রেণী শহরে ও চাষযোগ্য জমিতে স্থায়ী ভাবে বাস করে। আর এক শ্রেণী যাযাবর—ঘোড়া বা উটের পিঠে চড়িয়া মরুভূমিতে এদিক সেদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। ইহাদিগকে বলে বেদুইন। আরববাসীদের জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায় গোপালন, বাণিজ্য ও লুণ্ঠন। তাহারা বিভিন্ন কুলে (tribe) বিভক্ত অনেক সময় কোন কোন কুলের মধ্যে বংশগত শত্রুতা থাকে, দীর্ঘকাল মারামারি কাটাকাটি চলে। কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির এবং আশ্রয়প্রার্থীর প্রতি আরবদের সদাশয়তা প্রসিদ্ধ।

ইসলাম ধর্ম প্রচারের পূর্বে আরবেরা নানা দেবদেবীর মূর্তি পূজা করিত, কিন্তু প্রধান দেবতা ছিলেন আল্লা। পূজার কেন্দ্র ছিল আরব দেশের প্রধান শহর মক্কা। এখানে কাবা নামে একটি মন্দিরে সমগ্র আরব হইতে উপাসকেরা সমবেত হইত। মন্দিরের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত একখণ্ড কৃষ্ণ প্রস্তর তাহারা পবিত্র মনে করিত। ইসলাম ধর্ম প্রচারের পরেও মক্কা এবং কাবা তাহাদের পবিত্রতা হারায় নাই। মক্কা এখনও পৃথিবীর সকল দেশের মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থ। কাবার পবিত্র প্রস্তর প্রদক্ষিণ করা এখনও মক্কাযাত্রীর ধর্মের একটি অঙ্গ।

বেদুইনেরা কবিতা রচনা ও আবৃত্তি করিতে ভালবাসিত। সমাজে কবির যথেষ্ট সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। কিন্তু সঙ্গীত ও কবিতা ছাড়া সেকালের আরব সাহিত্যিক অন্য কোন বিষয়ের

চর্চা করিত না। আরবী ভাষার প্রথম ও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ কোরাণ ইসলামের দান।

হজরত মহম্মদ

মক্কার অভিজাত কোরেশ বংশে মহম্মদের জন্ম হয়। তাঁহার জন্মের পূর্বেই তাঁহার পিতার মৃত্যু হয়। ছয় বৎসর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। বাল্যকালে তাঁহার পিতামহ তাঁহাকে লালন-পালন করেন। বোধ হয় তিনি নিরক্ষর ছিলেন।

পঁচিশ বৎসর বয়সে মহম্মদ খদিজা নামে এক বিধবাকে বিবাহ করেন। তিনি এক ধনবান বণিকের পত্নী ছিলেন। স্বামীর মৃত্যুর পর তিনি নিজেই স্বাধীনভাবে বাণিজ্য পরিচালনা করিতেন। বিবাহের পর মহম্মদ অর্থচিন্তা হইতে মুক্ত হইলেন, খদিজার প্রচুর অর্থ থাকায় তাঁহার আর অর্থোপার্জনের প্রয়োজন রহিল না। কিছুদিন হইতে তাঁহার মনে ধর্ম সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জাগিতেছিল। এখন অবসর পাইয়া তিনি সেগুলির সমাধান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি অনেক সময় মক্কার নিকটবর্তী এক পাহাড়ের গুহায় যাইয়া গভীর চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। সেখানে একদিন তিনি নাকি অকস্মাৎ ঈশ্বরের নির্দেশ শুনিতে পাইলেন। তিনি জানিতেন, ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় এবং তিনি নিজে তাঁহার শেষ নবী। পরে ধর্ম সম্বন্ধে আরও অনেক নির্দেশ আসিল। বিভিন্ন সময়ে মহম্মদ ঈশ্বরের যে সকল নির্দেশ পাইয়াছিলেন তাহাই কোরাণে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে।

নূতন সত্যের সন্ধান পাইয়া মহম্মদ মক্কায় ধর্ম প্রচার আরম্ভ

করিলেন। প্রথমে মক্কাবাসীরা তাঁহাকে ঠাট্টা করিতে লাগিল, নূতন ধর্মকে পাগলামি বলিয়া উড়াইয়া দিল। কিন্তু ধীরে ধীরে অনেকে এই ধর্ম গ্রহণ করিল। সর্বপ্রথমে দীক্ষিত হইলেন খদিজা। নূতন ধর্মের নাম ইসলাম, আর এই ধর্মে যাহারা বিশ্বাসী তাহাদিগকে বলা হয় মুসলমান।

মহম্মদের শিষ্যসংখ্যা বাড়িতেছে দেখিয়া কোরেশদিগের মনে আশঙ্কা জাগিল। তাহারা নানাপ্রকারে নব ধর্মে বিশ্বাসীদের প্রতি উৎপাড়ন ও নির্যাতন করিতে লাগিল। বহু মুসলমান অত্যাচার এড়াইবার জন্য মক্কা ছাড়িয়া অ্যাবিসিনিয়া দেশে চলিয়া গেল। শেষে মহম্মদের পক্ষেও মক্কায় থাকা কঠিন হইল। আরবের আর একটি প্রধান শহর মদিনা। মদিনাবাসীদের আমন্ত্রণে তিনি শিষ্যদিগকে লইয়া সেখানে চলিয়া গেলেন। মহম্মদের মদিনা যাত্রাকে 'হিজরত' বলা হয়। তিনি যে দিন মদিনায় উপস্থিত হন সেই দিন হইতে মুসলমান সমাজে 'হিজিরা' সন গণনা করা হয়।

মদিনাবাসীরা পরম সমাদরে মহম্মদকে ধর্মনায়ক ও শাসক রূপে গ্রহণ করিল। মক্কায় যিনি কেবল ধর্ম চিন্তায় ও ধর্ম প্রচারে নিয়োজিত ছিলেন, মদিনায় তাঁহাকে শাসনকার্যে ও যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইতে হইল। আরবের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে নানা কুলের লোক নূতন ধর্ম গ্রহণ করিল, রাজনৈতিক ব্যাপারে মদিনার কর্তৃত্ব মানিয়া লইল। আরব দেশে বহু ইহুদী ও খ্রীষ্টান বাস করিত। মহম্মদ তাহাদিগকে নিজ নিজ ধর্ম পালন করিয়া মদিনার অধীনে বাস করিতে অনুমতি দিলেন। এদিকে

মক্কাবাসীদের সহিত মহম্মদের নেতৃত্বে মদিনাবাসীদের কয়েক বৎসর যাবৎ যুদ্ধ চলিতেছিল। মক্কাবাসীরা বার বার পরাজিত হইয়া শেষে মহম্মদের কাছে আত্মসমর্পণ করিল। তিনি সগৌরবে মক্কায় ফিরিয়া আসিলেন। বহু দেবমূর্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া তিনি পুরাতন ধর্মের চিহ্ন লোপ করিলেন।

মদিনায় যাওয়ার দশ বৎসর পরে মহম্মদের মৃত্যু হয়। ইহার পূর্বেই আরব দেশের প্রায় সর্বত্র ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হইয়াছিল। ধর্মের ঐক্যের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক ঐক্যও আসিয়াছিল। আরব জাতির যে সকল কুল কখনও এক শাসকের অধীনতা স্বীকার করে নাই তাহারা মহম্মদের প্রভাবে এক জাতিতে পরিণত হইল।

ইসলামের নির্দেশ

ইসলাম ধর্মের নির্দেশগুলি কোরাণে পাওয়া যায়। মুসলমানদের বিশ্বাস এই যে কোরাণে স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, ইহা মানুষের রচিত নহে। কোরাণের ভাষা বিশুদ্ধ আরবী। মুসলমানদের মতে ইসলাম সকল মানুষের ধর্ম, ইহাতে জাতিগোত্রের ভেদ নাই। ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং মহম্মদকে তাঁহার নবী (Prophet) বলিয়া গণ্য করে। অন্য যে সকল ধর্ম এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসী (যেমন খ্রীষ্ট ধর্ম) তাহাদিগকেও মুসলমানেরা শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে।

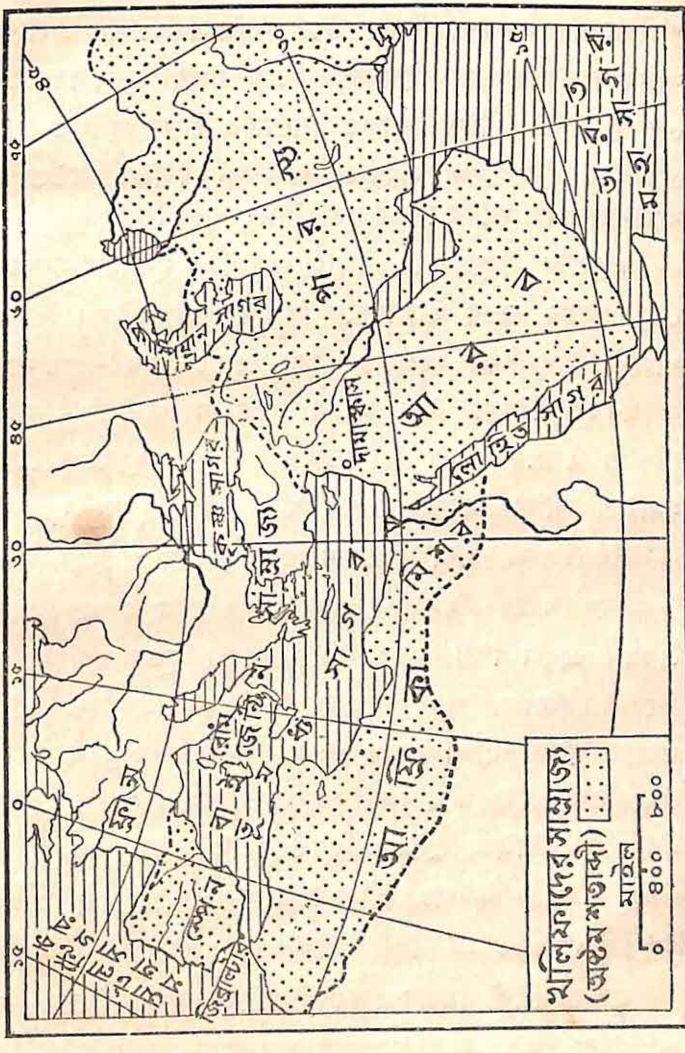
ধর্ম সম্বন্ধে প্রত্যেক মুসলমানের পাঁচটি প্রধান কর্তব্য

আছে। এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখিতে হইবে এবং মহম্মদকে তাঁহার বাণীর প্রচারক ('রসূল') রূপে শ্রদ্ধা করিতে হইবে। দৈনিক পাঁচ বার মক্কার দিকে মুখ রাখিয়া আল্লার নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। আয়ের একটি অংশ দান করিতে হইবে। রমজান মাসে সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত উপবাস করিতে হইবে। এই পবিত্র মাসে মহম্মদ নাকি প্রথম আল্লার বাণী শুনিতে পাইয়াছিলেন। সম্ভব হইলে জীবনে অন্ততঃ একবার তীর্থযাত্রী রূপে মক্কায় যাইতে হইবে। ইহা ছাড়া ইসলাম ধর্ম প্রচারের চেষ্টা করাও একটি অবশ্য করণীয় কর্তব্য।

আরব দেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারের ফলে নবজীবনের সঞ্চার হয়। সকল শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব প্রচার করিয়া ইসলাম নূতন সাম্রাজ্যের পত্তন করে। ধর্মের উন্নত আদর্শে আরব-সমাজ হইতে অনেক কুসংস্কার দূর হয়। নূতন বিশ্বাসে ও নূতন উৎসাহে উদ্দীপিত আরব জাতি মানুষের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূত্রপাত করিল।

ইসলামের জয়যাত্রা

মহম্মদের মৃত্যুর পর মাত্র একশত বৎসরের মধ্যে তাঁহার প্রচারিত ধর্ম পূর্বে (ভারতবর্ষের অন্তর্গত) সিন্ধুদেশ হইতে পশ্চিমে (ইউরোপের অন্তর্গত) স্পেন দেশ পর্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আরবেরা কেবল ধর্ম প্রচার করে নাই, সাম্রাজ্য গঠনও করিয়াছিল। সমগ্র পশ্চিম এশিয়া (আরব, সিরিয়া, ইরাক, আর্মেনিয়া, পারস্য), মধ্য এশিয়া (আফগানিস্তান,


খলিফাদের সাম্রাজ্য
(অষ্টম শতাব্দী)
মাইল
০ ৪০০ ৮০০
লোহিত সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
কৃষ্ণ সাগর
দামাস্কাস
স্পেন

তুর্কীস্তান), সিন্ধুদেশ, মিশর, উত্তর আফ্রিকা ও স্পেন তাহাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। এক সময়ে সিসিলি দ্বীপে এবং ইটালীর দক্ষিণ ভাগেও আরবদের রাজত্ব স্থাপিত হয়। এই বিশাল সাম্রাজ্যে নানা জাতির বাস। বিজিত জাতিগুলির কাছে আরবেরা অনেক বিষয়ে নূতন শিক্ষা পাইয়াছিল।

মহম্মদের মৃত্যুর পর যাঁহারা নবগঠিত মুসলমান-সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তাঁহাদিগকে 'খলিফা' বলা হইত। প্রথম খলিফা আবু বকর মহম্মদের প্রথম তিন চার জন শিষ্যের মধ্যে একজন। খলিফার উচ্চ আসন লাভ করিয়াও তিনি অতি সাধারণ লোকের মত থাকিতেন। মদিনায় মহম্মদের তৈরী মসজিদে বসিয়া সরকারী কাজ করা হইত, পৃথক সরকারী কার্যালয় ছিল না। খলিফা কোন বেতন বা ভাতা পাইতেন না।

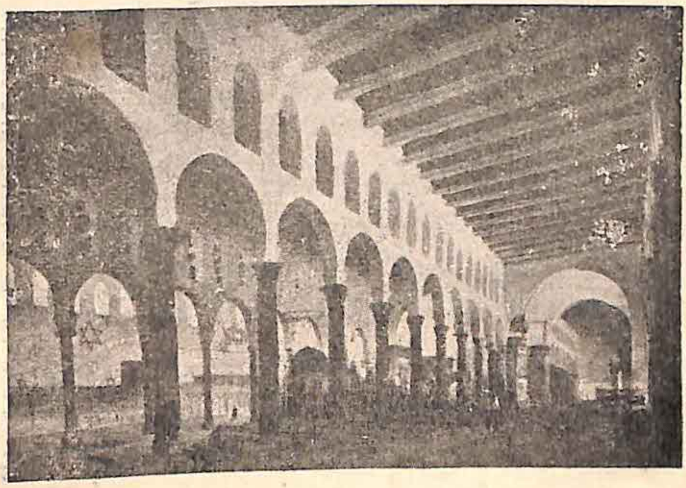
আবু বকরের মৃত্যুর পর খলিফা হইলেন মহম্মদের আর একজন প্রধান শিষ্য ওমর। তিনি প্রথমে নূতন ধর্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন, পরে মহম্মদের চরিত্রমাধুর্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। ওমরের সুদৃঢ় ধর্মবিশ্বাস এবং উন্নত চরিত্র দীর্ঘকাল মুসলমান-সমাজের আদর্শ হইয়া রহিয়াছে। খলিফা হইবার পরেও তিনি একটি মাত্র ছেঁড়া জামা ও চাদর ব্যবহার করিতেন, তালপাতা বিছাইয়া তাহার উপর ঘুমাইতেন।

তৃতীয় খলিফা ওসমান এবং চতুর্থ খলিফা আলী বিদ্রোহীদের হস্তে নিহত হন। আলী মহম্মদের কন্যা ফতেমাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। মহম্মদের প্রথম তিন জন শিষ্যের মধ্যে তিনি একজন।

প্রথম চারি জন খলিফা ইসলামের ইতিহাসে 'গোঁড়া খলিফা' ("Orthodox Caliphs") বা ধার্মিক খলিফা ("Pious Caliphs") নামে পরিচিত। তাঁহারা সমাজে ও ধর্মজীবনে ইসলামের সকল নির্দেশ পালন করাইবার চেষ্টা করিতেন।

কারবালা

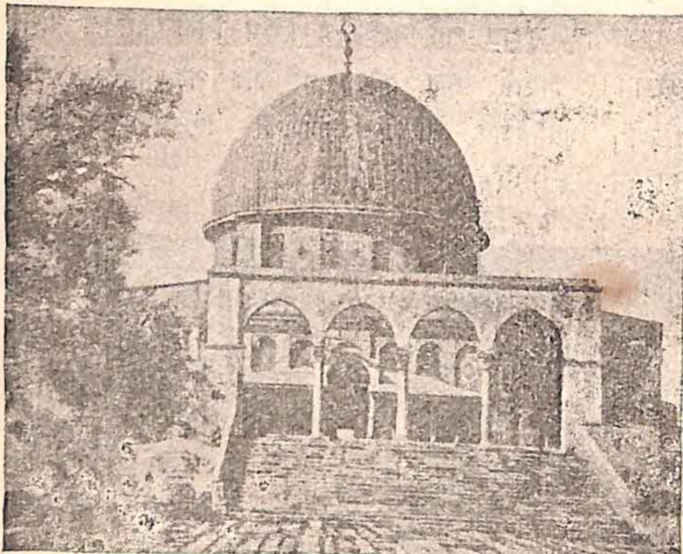
আলীর মৃত্যুর পর মহম্মদের প্রিয় শিষ্য মুয়াবিয়া খলিফা হইলেন। তাঁহার সময় হইতে খলিফার পদ বংশগত হইয়া পড়িল। মুয়াবিয়ার প্রতিষ্ঠিত খলিফা বংশের নাম উমায়া (Umayyad) বংশ।



উমায়া বংশের আমলে নির্মিত মসজিদ—দামস্কাস

মুয়াবিয়ার পুত্র এজিদের রাজত্বকালে ইসলামের ইতিহাসে একটি মর্মস্পর্শী দুর্ঘটনা ঘটে। আলীর মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ

পুত্র হাসান কিছুকাল ইরাকে রাজত্ব করেন। পরে মুয়াবিয়ার সহিত সন্ধি করিয়া তিনি সিংহাসন ত্যাগ করেন। তাঁহার শত্রুরা তাঁহাকে হত্যা করে। তাঁহার ছোট ভাই হোসেন মুয়াবিয়ার মৃত্যুর পর এজিদকে খলিফা বলিয়া স্বীকার করেন নাই। ফলে ইরাকের রাজধানী কূফা নগরের ২৫ মাইল দূরে কারবালা



জেরুজালেমের উমায়া বংশের আমলে নির্মিত প্রসিদ্ধ মসজিদ
—Dome of the Rock নামে পরিচিত

প্রান্তরে এজিদের সৈন্যদল হোসেনকে পরাজিত করে। হোসেন যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। কারবালা প্রান্তরেই তাঁহাকে কবর দেওয়া হয়।

আলী এবং তাঁহার পুত্রদের সমর্থকগণ 'শিয়া' নামে

পরিচিত। শিয়া সম্প্রদায়ের মতে তাঁহারাই প্রকৃত খলিফা, মুয়াবিয়া ও এজিদ অন্যায়ভাবে সিংহাসন অধিকার করিয়াছিলেন। আলী ও তাঁহার দুই পুত্রের মৃত্যুর জন্য শিয়ারা মুয়াবিয়া ও এজিদকে দায়ী করে। কারবালার প্রান্তরে এই কলহের শেষ হয় নাই। সমগ্র পৃথিবীর মুসলমান সমাজ 'শিয়া' ও 'সুন্নী'—এই দুই ভাগে ভাগ হইয়া গিয়াছে। ধর্মমত ও রীতিনীতি সম্বন্ধে তাহাদের মধ্যে খানিকটা পার্থক্য আছে।

কারবালার দুর্ঘটনা শিয়ারা ভুলিতে পারে নাই। এখনও মহরম পর্বে তাহারা হাসান-হোসেনের শোচনীয় মৃত্যুর জন্য শোক প্রকাশ করে।

আব্বাস বংশের রাজত্ব

উমায়া বংশীয় খলিফাগণ প্রায় ৯০ বৎসর রাজত্ব করেন। ইহার পর মহম্মদের কাকা আব্বাসের বংশধরগণ পাঁচ শত বৎসর খলিফার পদ অধিকার করেন। আব্বাস বংশের (Abbasids) রাজত্বকালে আরব-সভ্যতা চরম উন্নতি লাভ করে। ইহাই ইসলামের ইতিহাসে সুবর্ণ যুগ।

আব্বাস বংশের শ্রেষ্ঠ খলিফা হারুণ অল-রশীদ আরব্য উপন্যাসের গল্পে সুপরিচিত। তাঁহার রাজধানী বাগ্‌দাদ ঐশ্বর্যে ও সৌন্দর্যে সেকালে অতুলনীয় ছিল। পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের রাজধানী বাইজেন্টিয়াম্ ছাড়া তখন সমৃদ্ধিতে বাগ্‌দাদের সমকক্ষ শহর আর ছিল না।

বাগ্‌দাদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ব্যাপিয়া ছিল খলিফার প্রাসাদ। প্রাসাদের ঐশ্বর্য ও জাঁকজমক দেখিলে চক্ষু

ঝল্‌সাইয়া যাইত। খলিফার বেগম মণি-মুক্তার কাজ করা সোনার পাত্রে জল খাইতেন, মূল্যবান পাথর বসানো জুতা পরিতেন। রাজসভায় বহু কবি, গায়ক ও নর্তক সাদরে প্রতিপালিত হইত। মুরগীর লড়াই, কুকুরের লড়াই প্রভৃতি সেকালের সাধারণ আমোদ-প্রমোদের অঙ্গ ছিল।

বড় বড় রাজকর্মচারীরা খলিফার ঐশ্বর্য ও বিলাসের খানিকটা অংশ পাইতেন। সমাজেও তাঁহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য বৃহৎ সৈন্যদল প্রয়োজন হইত। সৈন্যদলে নানা জাতির লোক থাকিত। হারুণ অল-রশীদ যুদ্ধ-ক্ষেত্রে আহত সৈন্যদলের চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল স্থাপন করেন। সমাজের সব চেয়ে নীচু শ্রেণী ছিল ক্রীতদাসেরা। তাহারা সাধারণতঃ ঘরের কাজ করিত। ক্রীতদাসীদের মধ্যে কেহ কেহ ভাল লেখাপড়া জানিত। খলিফাদের প্রাসাদে ও বড়লোকদের বাড়ীতে বহু ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী থাকিত।

আব্বাস বংশীয় খলিফারা পাণ্ডিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, বিদ্যাচর্চায় তাঁহাদের যথেষ্ট উৎসাহ ছিল। তাঁহাদের সময়ে নানা দেশের নানা শ্রেণীর পণ্ডিত বাগ্‌দাদে সমবেত হইতেন। ভারতবর্ষ হইতে এক পণ্ডিত বাগ্‌দাদে গণিত ও জ্যোতিষ প্রচার করেন। গ্রীকদের নিকট হইতে আরবেরা পাইয়াছিল দর্শন ও বিজ্ঞান। কয়েকখানি সংস্কৃত বই এবং অনেক গ্রীক বই আরবী ভাষায় অনুবাদ করা হইয়াছিল। হোমারের 'ইলিয়াড', অ্যারিস্টটলের দর্শন, ইউক্লিডের জ্যামিতি প্রভৃতি বইয়ের আরবী অনুবাদ সেকালে অনেকে পড়িত। অনুবাদকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ

ছিলেন মহাপণ্ডিত হুনায়ন ইব্‌ন্ ইসাক। তিনি ধর্মে খ্রীষ্টান ছিলেন। চিকিৎসাবিদ্যায় তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল এবং তিনি খলিফার প্রধান চিকিৎসক হইয়াছিলেন।

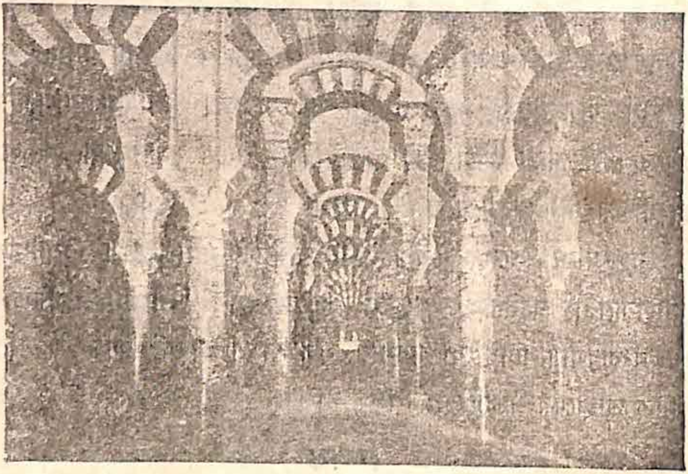
বাগ্‌দাদ তখন পৃথিবীর একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। আরব বণিকেরা পূর্বে চীন হইতে পশ্চিমে স্পেন পর্যন্ত নানা দেশের সহিত বাণিজ্য করিত। চীন হইতে আসিত রেশম, মধ্য এশিয়া হইতে নানারকম ফল ও মণিমুক্তা, ভারতবর্ষ হইতে মসলা, রাশিয়া ও উত্তর ইউরোপ হইতে মধু ও মোম। ইহা ছাড়া খলিফাদের বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে উৎপন্ন নানারকম জিনিস বাগ্‌দাদের বাজারে পাওয়া যাইত। আবার বাগ্‌দাদ হইতে ইউরোপ ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে মণিমুক্তা, মসলা প্রভৃতি রপ্তানি করা হইত।

বাগ্‌দাদে অনেক বেশী ধনী বণিকের বাস ছিল। সাধারণ দোকানদারী করিয়াও অনেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করিত। আইন ব্যবসায়, চিকিৎসা ব্যবসায়, শিক্ষকতা প্রভৃতি কাজ যাহারা করিত তাহাদের সংখ্যাও কম ছিল না।

স্পেন

ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে স্পেন দেশে আরবেরা প্রায় আট শত বৎসর রাজত্ব করে। প্রথমে কিছুদিন স্পেন খলিফাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে স্পেনের আরব শাসকেরা স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন সুশিক্ষিত, বিদ্যোৎসাহী ও শিল্পানুরাগী ছিলেন। তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায় স্পেনে একটি উন্নত সভ্যতার সৃষ্টি হয়।

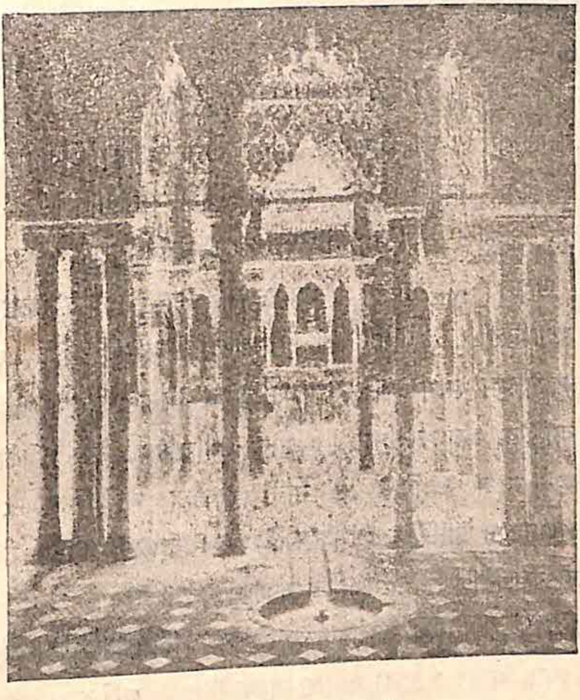
স্পেনের আরব শাসকেরা বহু মসজিদ ও প্রাসাদ নির্মাণ করেন। এগুলি আকৃতিতে বেশ বড়, গঠনৈনপুণ্যে ও কারুকার্যে অতি সুন্দর। কর্ডোভার বিরাট মসজিদে ১২৯৩টি স্তম্ভ ছিল। মধ্যভাগ আলোকিত করিবার জন্য অনেক বিচিত্র ঝাড়লণ্ঠন বসানো হইয়াছিল। কারুকার্যের ভার দেওয়া হইয়াছিল সুদক্ষ বাইজেন্টিন শিল্পীদের উপর। গ্রানাডা শহরে আলহাম্‌রা নামক প্রাসাদদুর্গের দেওয়াল নানারকম



কর্ডোভার মসজিদ

চিত্রিত পাথরে এবং কারুকার্যে সুশোভিত করা হইয়াছিল। দুর্গের মাঝখানে এক চত্বরে বারটি মর্মর প্রস্তরে তৈরী সিংহ দাঁড়াইয়া আছে, তাহাদের মুখগহ্বর হইতে জলস্রোত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। একটি বড় কোঠার ছাদের নীচের দিকে চামড়ার উপরে আঁকা ছবি সাজাইয়া রাখা হইয়াছে।

স্পেনের আরব শাসকদের দরবারে জ্ঞানী ও গুণীর বিশেষ সমাদর ছিল। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ইব্‌ন্ খলদূন এক সময়ে গ্রানাডার সুলতানের কর্মচারী ছিলেন। কয়েকজন প্রসিদ্ধ কবি ও লেখক স্পেনে আরবী সাহিত্যের উন্নতি করিয়াছিলেন।



আলহাম্‌রার অভ্যন্তর

স্পেনে উচ্চ শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল। কর্ডোভা, সেভিল, মালাগা, গ্রানাডা প্রভৃতি বড় বড় শহরে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল। আইন, ধর্মশাস্ত্র, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, দর্শন প্রভৃতি

বিষয় শিক্ষা দেওয়া হইত। কর্ডোভা পুস্তক ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র ছিল। এখানকার বাজারে নানারকম হাতে লেখা বই পাওয়া যাইত। কর্ডোভায় একটি বিরাট রাজকীয় পাঠাগার ছিল। ধনী ব্যক্তিরাও অনেক সময়ে পুস্তক সংগ্রহ করিয়া পাঠাগার স্থাপন করিতেন।

সভ্যতায় আরবদের দান

আরবেরা কেবল ইসলাম ধর্ম প্রচার ও রাজ্য বিস্তার করে নাই, তাহারা একটি উন্নত সভ্যতা সৃষ্টি করিয়াছিল। গ্রীক, পারসিক প্রভৃতি সুসভ্য জাতিরা পূর্বে জ্ঞান-বিজ্ঞানে ও শিল্পে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছিল। আরবেরা নানা বিষয়ে তাহাদের নিকট ঋণী ছিল। আবার আরব ছাড়া অন্যান্য অনেক জাতি আরব-সাম্রাজ্যে বাস করিত। তাহাদের মধ্যে অনেক জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির জন্ম হইয়াছে। গ্রীক, পারসিক, ইহুদী, খ্রীষ্টান, ভারতীয়—নানা জাতির ও নানা শ্রেণীর সম্মিলিত চেষ্টায় আরব-সভ্যতার উন্নতি ও প্রসার ঘটিয়াছে। সুতরাং আরব-সভ্যতা বলিতে কেবলমাত্র আরব জাতির সভ্যতা বুঝায় না।

গণিত, জ্যোতিষ, রসায়ন, ইতিহাস, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি নানা বিষয়ে আরব-সভ্যতা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। গণিত ও জ্যোতিষ সম্বন্ধে কয়েকখানি সংস্কৃত ও গ্রীক বই আরবীতে অনুবাদ করা হইয়াছিল। আরব জ্যোতিষীরা নানারকম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি লক্ষ্য করিতেন। গজনার সুলতান মামুদের সভাপণ্ডিত অল-বীরুনি গণিত ও

জ্যোতিষ সম্বন্ধে কয়েকখানি বই লিখিয়াছিলেন। তিনি সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতবর্ষে আসিয়া সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন এবং হিন্দুদের সভ্যতা সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

রসায়ন এবং চিকিৎসাবিদ্যায় আরব পণ্ডিতেরা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। অল-তবরি খলিফার চিকিৎসক ছিলেন এবং চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে 'জ্ঞানের স্বর্গ' নামে একখানা বড় বই লিখিয়াছিলেন। মহাপণ্ডিত ইব্‌ন্ সিনা একাধারে চিকিৎসক, দার্শনিক, ভাষাতত্ত্ববিদ এবং কবি ছিলেন। নানা বিষয়ে অসামান্য পাণ্ডিত্যের জন্য আরব-জগতে তিনি "জ্ঞানী ব্যক্তিদের মধ্যে রাজা" নামে পরিচিত হন। চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার লেখা একখানি বইয়ের ল্যাটিন অনুবাদ দীর্ঘকাল ইউরোপের নানা দেশে সাদরে পড়া হইত।

আরব-জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন স্পেনের অধিবাসী ইব্‌ন্ রুশ্‌দ। দর্শনশাস্ত্র ছাড়া তিনি জ্যোতিষ এবং চিকিৎসাবিদ্যা সম্বন্ধেও বই লিখিয়াছিলেন। অ্যারিস্টটলের বইগুলির উপর তাঁহার লেখা টীকা দীর্ঘকাল ইউরোপে প্রচলিত ছিল।

ইতিহাসের চর্চায় আরবদের খুব উৎসাহ ছিল। ইব্‌ন্ খলদূনের কথা আগেই বলা হইয়াছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অল-বীরুণির বই একখানি মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ। মরক্কো নিবাসী ভূপর্যটক ইব্‌ন্ বতুতা দিল্লীর সুলতান মহম্মদ তুঘলুকের রাজত্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়া কয়েক বৎসর এদেশে বাস করেন। তাঁহার লেখা বইতে নানা দেশের খবর পাওয়া যায়, আমাদের বাঙ্গালা দেশের কথাও ইহাতে আছে।

বৈজ্ঞানিক অল-তবরির কথা উপরে বলা হইয়াছে। আর এক অল-তবরি ছিলেন ঐতিহাসিক। তিনি আরবী ভাষায় সমগ্র মুসলমান-জগতের ইতিহাস রচনা করেন।

আরবেরা এক দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্য দেশে প্রচার করিয়া বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে সংযোগ সাধন করিয়াছিল। ভারতবর্ষ হইতে সংখ্যা লিখিবার পদ্ধতি এবং বীজগণিত তাহারা ইউরোপে লইয়া গিয়াছিল। ইউরোপীয়দিগকে তাহারা চিকিৎসাবিদ্যা শিখাইয়াছিল। কাগজ তৈরী করিবার পদ্ধতি চীনে প্রথম আবিষ্কৃত হয়। চীন হইতে আরবেরা ইহা ইউ-রোপে প্রচার করে। প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতদের লেখা অনেক বই তাহারা আরবীতে অনুবাদ করিয়া রক্ষা করে। অনেক ক্ষেত্রে মূল গ্রীক বই আর পাওয়া যায় না, শুধু আরবী অনুবাদ পাওয়া যায়। আরব বণিকেরা বাণিজ্য দ্রব্যের সঙ্গে সঙ্গে নূতন ভাব, নূতন জ্ঞান ও নূতন আদর্শ দেশ-দেশান্তরে লইয়া যাইত।

খ্রীষ্টাব্দ	—৫৭১	মহম্মদের জন্ম
	—৬২২	(২৪শে সেপ্টেম্বর) মহম্মদের মদিনায় আগমন: হিজিরা সনের আরম্ভ
	—৬৩২	মহম্মদের মৃত্যু
	—৬৩২-৬১	চারিজন ধার্মিক খলিফার রাজত্বকাল
	—৬৬১-৭৫০	উমায়া বংশীয় খলিফাদের রাজত্বকাল
	—৬৮০	কারবালার যুদ্ধ
	—৭৫০-১২৫৮	আব্বাস বংশীয় খলিফাদের রাজত্বকাল
	—৭১১	আরবদের স্পেন জয়
	—৯২৯-১০৩৯	স্পেনের উমায়া বংশীয় স্বাধীন খলিফাদের রাজত্বকাল

ষষ্ঠ অধ্যায়

শার্লামেন

'বর্বর' জাতিদের আক্রমণে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ইহার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন 'বর্বর' জাতির রাজ্য স্থাপিত হয়। বর্তমান ফ্রান্স ও জার্মানীর খানিকটা লইয়া ছিল ফ্রাঙ্ক জাতির রাজ্য। ফ্রাঙ্কেরা জার্মান গোষ্ঠীর একটি জাতি। তাহারা খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ সভ্য হইয়া উঠিতেছিল।

ফ্রাঙ্ক জাতির রাজাদের মধ্যে সব চেয়ে বড় এবং সব চেয়ে বিখ্যাত ছিলেন চার্ল্‌স্‌। ইতিহাসে তিনি 'মহান্ চার্ল্‌স্‌' (Charles the Great) বা 'শার্লামেন' (Charlemagne) নামে প্রসিদ্ধ। ল্যাটিন ভাষায় 'শার্লামেন' নামের অর্থ 'মহান চার্ল্‌স্‌'। বাগ্‌দাদে যখন হারুণ অল-রশীদের রাজত্ব চলিতেছিল ঠিক সেই সময়েই শার্লামেন ফ্রাঙ্কদের রাজা ছিলেন।

সেকালের একজন বড় লেখক আইন্‌হার্ড (Eginhard) শার্লামেনের জীবনী লিখিয়াছেন। এই বই পড়িলে শার্লামেনের চেহারা ও চরিত্র সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। তাঁহার শরীর লম্বা ও সুগঠিত ছিল। নাক লম্বা ও সরু, উজ্জ্বল চক্ষু। শরীরে অসাধারণ শক্তি ছিল—তিনি তরবারির এক আঘাতে আরোহী সহ ঘোড়া কাটিয়া ফেলিতে পারিতেন। সূতার তৈরী আঙ্গরাখা এবং লম্বা গাত্রাবরণ—ইহাই ছিল তাঁহার পোষাক। তিনি

কঠোর পরিশ্রম করিতেন। বড় বড় রাজকর্মচারী এবং অভিজাত ব্যক্তিদের সহিত তিনি অবাধে মেলামেশা করিতেন। হাসি-ঠাট্টা তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। অনেক সময় তিনি লোকজনকে নানারকম প্রশ্ন করিয়া বিব্রত করিতেন।



শার্লামেন

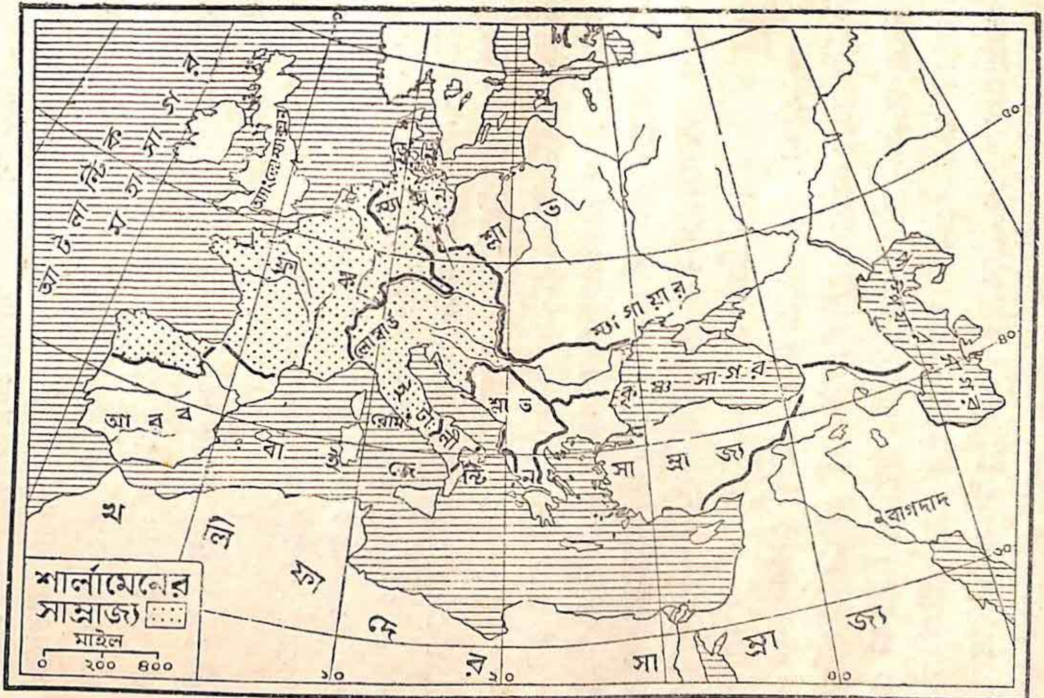
শার্লামেনের পৈতৃক রাজ্য বেশ বড় ছিল, কিন্তু তিনি তাহাতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া বাহুবলে রাজ্যের সীমা অনেকখানি প্রসারিত করেন। তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালে তিনি পঞ্চাশ বারের বেশী যুদ্ধ করিয়াছিলেন। মধ্য যুগের ইউরোপে তাঁহার মত বিজয়ী বীর আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। বর্তমান ফ্রান্স ও ইটালী, জার্মানীর একটি বড় অংশ এবং স্পেনের এক টুকরা তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শার্লামেনের রাজ্যলাভের পূর্বেই স্পেনে আরবদের অধিকার স্থাপিত হয়। স্পেন এবং ফ্রান্স কাছাকাছি দেশ। আরবদের সঙ্গে ফ্রাঙ্কদের প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ চলিত। শার্লামেন

আরবদিগকে পরাজিত করিয়া স্পেনের একটি সীমান্ত অঞ্চল অধিকার করেন। আরবদের সহিত যুদ্ধে রোল্যাণ্ড (Roland) নামে ফ্রাঙ্ক জাতির এক অভিজাতবংশীয় বীর নিহত হন। পরে তাঁহার বীরত্ব সম্বন্ধে একটি কবিত্বপূর্ণ গাথা রচিত হয়। এই গাথা দীর্ঘকাল ফ্রান্সে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। মধ্য যুগের ইউরোপীয় সাহিত্যের ইহা একটি প্রসিদ্ধ রচনা।

দুর্দান্ত স্যাক্সন জাতির বাস ছিল জার্মানীতে। স্যাক্সনেরা নানা দেব-দেবীর পূজা করিত, খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করে নাই। শার্লামেন দীর্ঘকালের চেষ্টায় তাহাদিগকে বশীভূত করেন। তাঁহার সহিত যুদ্ধে স্যাক্সনদিগকে বহু অত্যাচার সহ্য করিতে হইয়াছিল। তিনি নির্বিচারে স্যাক্সন বন্দীদিগকে হত্যা করিতেন, তাহাদের বাড়ী-ঘর জ্বালাইয়া দিতেন। সময় সময় তিনি এক জায়গার লোক সরাইয়া অন্য জায়গায় তাহাদের নূতন বাসস্থান তৈরী করিতে বাধ্য করিতেন। উৎপীড়িত স্যাক্সনেরা সহজে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে নাই। দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া, বারবার বিদ্রোহ করিয়া তাহারা তাঁহাকে বিব্রত করিয়াছিল।

শার্লামেন যে স্যাক্সনদের দেশে কেবল অত্যাচার করিয়াছিলেন তাহা নহে। তিনি নানা প্রকারে তাহাদিগকে সভ্য করিবার চেষ্টা করেন। তিনি তাহাদিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করেন। তাঁহার নির্দেশে বহু খ্রীষ্টধর্মপ্রচারক স্যাক্সনদের দেশে গমন করে এবং খ্রীষ্টীয় উপাসনার কেন্দ্রস্বরূপ কয়েকটি গির্জা নির্মিত হয়। কিন্তু কেবল ধর্মপ্রচারেই তাঁহার প্রচেষ্টা সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বনজঙ্গল পরিষ্কার করাইয়া


শার্লামেনের
সাম্রাজ্য
মাইল
০ ২০০ ৪০০
আটলান্টিক মহাসাগর
আংলো-স্যাক্সন
আরব
রোম
ম্যাগায়ার
কৃষ্ণ সাগর
বাগদাদ
লোম্বার্ড
খলীফা দের সাম্রাজ্য

রাস্তাঘাট ও সেতু নির্মাণের ব্যবস্থা করেন। তাঁহার রাজত্বকালে জার্মানীর এক বৃহৎ অংশে নূতন সভ্যতার যুগ আরম্ভ হয়।

শার্লামেনের খ্যাতি কেবল ইউরোপে নয়, ইউরোপের বাহিরেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। খলিফা হারুণ অল-রশীদ তাঁহার রাজসভায় দূত পাঠাইয়াছিলেন। খলিফার নিকট হইতে যে সকল উপহার আসিয়াছিল তাহার মধ্যে ছিল একটি ঘড়ি ও একটি হাতী। সেকালের ফ্রাঙ্কদের কাছে ঘড়ি ও হাতীর খুব সমাদর হইয়াছিল।

খ্রীষ্টানদের ধর্মগুরু পোপ রোমে বাস করিতেন। রোমে তখন সম্রাট নাই, ইটালীর বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন রাজার অধিকার। উত্তর ইটালীর লোম্বার্ড জাতি (Lombards) পোপের শত্রু। লোম্বার্ডদের শত্রুতা হইতে পোপকে রক্ষা করিলেন শার্লামেন। তিনি লোম্বার্ডদের রাজ্য অধিকার করিয়া লইলেন। রোমেও পোপের শত্রু ছিল। শার্লামেন তাহাদের অত্যাচার হইতে পোপকে রক্ষা করিলেন। কৃতজ্ঞ পোপ তাঁহাকে রোমের সম্রাট রূপে অভিষেক করিলেন। ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টমাস পর্বের সময় শার্লামেন রোমে সেন্ট পিটারের গির্জায় হাঁটু গাড়িয়া উপাসনা করিতেছিলেন। হঠাৎ পোপ তাঁহার মস্তকে সোনার মুকুট পরাইয়া দিলেন। গির্জায় উপস্থিত জনসাধারণ নূতন সম্রাটের জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। পোপ যে এইভাবে তাঁহাকে সম্রাটের মুকুট পরাইয়া দিবেন তাহা শার্লামেন আগে জানিতে পারেন নাই।

শার্লামেনের অভিষেক ইউরোপের ইতিহাসে একটি বিশেষ

স্মরণীয় ঘটনা। ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের বিলোপ ঘটিয়াছিল, বাইজেন্টিয়াম্‌কে কেন্দ্র করিয়া পূর্ব রোম সাম্রাজ্য বর্তমান ছিল। ৩২৪ বৎসর পরে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য আবার প্রতিষ্ঠিত হইল। নানাবিধ রূপান্তরের মধ্য দিয়া পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাঁচিয়া ছিল। বহুদিন পর্যন্ত ইউরোপের মানুষ মনে করিত যে রোম সাম্রাজ্য মরে নাই, মরিতে পারে না।

শার্লামেন নামে রোমের সম্রাট হইলেও তিনি রোমে বাস করিতেন না, তাঁহার রাজধানী ছিল জার্মানীর অন্তর্গত আকেন (আয়-লা-সেপেল) শহর। সাম্রাজ্য শাসনে তিনি রোমের রীতি-নীতি ও আইনের পরিবর্তে ফ্রাঙ্ক জাতির পূর্বপ্রচলিত প্রথা অনুসরণ করিতেন। প্রকৃত পক্ষে শার্লামেনের আমলে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য ছিল ফ্রাঙ্ক-রাজ্যের নামান্তর মাত্র। তবু রোমের স্মৃতি বাঁচিয়া রহিল, ইউরোপের প্রাচীন সভ্যতা নূতন জীবন পাইল।

শার্লামেন জাতিতে ও আচার-ব্যবহারে খাঁটি ফ্রাঙ্ক হইলেও রোমের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল, রোমের গৌরব ফিরাইয়া আনিবার জন্য তিনি চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজধানী আকেন শহরের তিনি নাম দিয়াছিলেন—'নূতন রোম'। তাঁহার রাজপ্রাসাদে এবং আকেন শহরের গির্জায় ইটালী হইতে আনা চিত্রিত প্রস্তর বসানো হইয়াছিল।

নিজে নিরক্ষর হইলেও শার্লামেন সাহিত্যের ও পাণ্ডিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি লিখিতে পারিতেন না, কিন্তু ল্যাটিন

ভাষা বেশ জানিতেন, গ্রীকও কিছু কিছু বুঝিতেন। রাত্রিতে তাঁহার বালিশের নীচে লিখিবার উপকরণ রাখা হইত। তিনি যখন খাইতে বসিতেন তখন তাঁহাকে ইতিহাসের বই পড়িয়া শোনানো হইত। তাঁহার সভায় ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা সমবেত হইয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ইংরেজ পণ্ডিত আল্‌কুইন (Alcuin)। দুর্দান্ত ডেনদিগের আক্রমণে দেশছাড়া হইয়া তিনি শার্লামেনের সভায় আশ্রয় লাভ করেন। তাঁহার চেষ্টায় সম্রাটের প্রাসাদে এক পণ্ডিতমণ্ডলী ('Palace School') গঠিত হয়। কেবল বিদ্যাচর্চায় নয়—অন্যান্য বিষয়েও তিনি শার্লামেনের পরামর্শদাতা ছিলেন। অন্ধকারের যুগে শার্লামেন জ্ঞানের বাতি জ্বালাইয়া রাখিয়াছিলেন, সভ্যতার প্রদীপ যাহাতে যুদ্ধবিগ্রহের ঝড়ে নিভিয়া না যায় সেজন্য তিনি সর্বদা চেষ্টা করিতেন। ইহাই তাঁহার প্রধান কৃতিত্ব।

শার্লামেনের সময়ে পোপ সম্রাটের অধীন ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর আড়াই শত বৎসর পরে জার্মানজাতীয় সম্রাটদের সহিত পোপদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হয়। পোপেরা সম্রাটদের অধীনতা স্বীকার করা দূরে থাকুক, তাঁহাদের উপর কর্তৃত্বের দাবি করিতে লাগিলেন। পোপদের সহিত সম্রাটদের বিবাদের ফলে উভয়েরই শক্তি ক্ষয় হয়। শেষে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের শুধু নামটি বাঁচিয়া রহিল; সম্রাটের মর্যাদা রহিল, কিন্তু ক্ষমতা একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

খ্রীষ্টাব্দ

—৩৯৫ রোম সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত
—৪৭৬ পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের বিলোপ
—৭৬৮ শার্লামেনের রাজ্যলাভ
—৮০০ পোপ কর্তৃক শার্লামেনের অভিষেক
—৮১৪ শার্লামেনের মৃত্যু
—১০৭৫ সম্রাট ও পোপের বিবাদ আরম্ভ
—১৮০৬ পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের বিলোপ

সপ্তম অধ্যায়

মধ্য যুগের ইউরোপে মানুষের জীবনযাত্রা

মধ্য যুগের ইউরোপে নানা কারণে নানা রকম অশান্তি ও উপদ্রব লাগিয়াই থাকিত, সাধারণ মানুষের ধনপ্রাণ নিরাপদ ছিল না। সেকালে এখনকার মত দেশের সকল অংশে সকল সময় রাজারা শান্তিরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিতেন না। ফলে সাধারণ মানুষ অনেক সময় নিজের ধনপ্রাণ রক্ষার ব্যবস্থা নিজেই করিতে বাধ্য হইত। অর্থ এবং অস্ত্রশস্ত্র না থাকায় সে প্রতিবেশী জমিদারের আশ্রয় লইত। জমিদারের অনুগত প্রজা হইয়া সে তাঁহাকে খাজনা দিত, তাঁহার জমিতে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করিত। বিনিময়ে জমিদার তাহার ধনপ্রাণ রক্ষা করিবার দায়িত্ব লইতেন। এইভাবে মধ্য যুগের সমাজে দুর্বল, স্বাধীনতার বিনিময়ে, প্রবলের আশ্রয়ে বাস করিত।

জমিদার ছিলেন জমির মালিক, সমাজের নায়ক। তাঁহাকে পরিশ্রম করিয়া জীবিকা অর্জন করিতে হইত না। প্রজারা তাঁহার জমি চাষ করিয়া দিত, তাঁহাকে খাজনা দিত। দাস শ্রেণীর পরিশ্রমে জমিদার শ্রেণীর ভরণ-পোষণ স্বচ্ছন্দে চলিত। কিন্তু রাজার প্রতি জমিদারের কর্তব্য ছিল। রাজার নিকট হইতেই জমিদার জমিদারী পাইতেন, বিনিময়ে তাঁহাকে রাজার জন্য যুদ্ধ করিতে এবং রাজার যুদ্ধের জন্য সৈন্য যোগাইতে হইত। জমিদারের সহিত একদিকে রাজার সম্বন্ধ, আর একদিকে প্রজাদের সম্বন্ধ।

উচ্চবংশীয় যুবকেরা অল্প বয়সেই যোদ্ধার জীবন বরণ করিয়া লইত। তাহারা ঘোড়ায় চড়িতে এবং অস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিত, কোন প্রবীণ যোদ্ধার দলভুক্ত হইয়া তাঁহার বর্ম বহন করিত। লেখাপড়ার তেমন আদর ছিল না, যোদ্ধার পক্ষে বর্ণজ্ঞানহীন হওয়াও অগৌরবের বিষয় বলিয়া গণ্য হইত না। যুদ্ধে যে কৃতিত্ব ও সাহস দেখাইত সমাজে তাহার খ্যাতি ছড়াইয়া পড়িত। তখন কোন রাজা বা বড় জমিদার তাহাকে সশস্ত্র মল্ল বা 'নাইট' (knight) বলিয়া স্বীকার করিয়া নূতন মর্যাদা দিতেন।

'নাইট'দিগকে কতকগুলি নির্দিষ্ট রীতি অনুসারে জীবন যাপন করিতে হইত। সাহস, আনুগত্য এবং ভদ্রতা—এই সকল গুণ 'নাইট'-চরিত্রের অলঙ্কার ছিল। 'নাইট' কখনও প্রাণের ভয় করিবে না, সকল বিষয়ে মনিব ও বন্ধুর প্রতি অনুগত ও বিশ্বস্ত থাকিবে, নিজের অনিষ্টের সম্ভাবনা থাকিলেও

দুর্বলকে রক্ষা করিবে। এই সকল গুণের আদর হওয়াতে সমাজে শৃঙ্খলা আসিল, 'বর্বর' জাতির বংশধরেরা ভদ্রভাবে উন্নত জীবন যাপন করিতে শিখিল। 'নাইটে'রা অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত থাকিত, প্রয়োজন হইলেই যুদ্ধ করিত। শিকারে

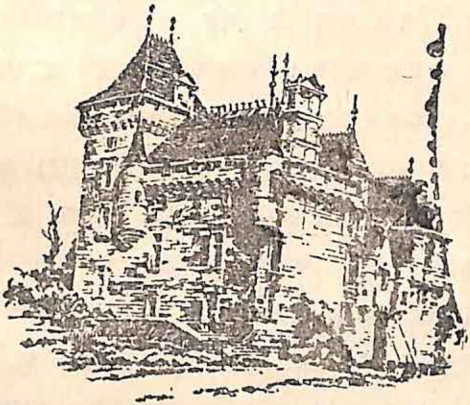


'নাইট'দের যুদ্ধ

তাহাদের খুব উৎসাহ ছিল। সময় সময় তাহারা ক্রীড়াযুদ্ধে (tournament) যোগদান করিয়া নিজেদের সাহস ও অস্ত্র-প্রয়োগ কৌশলের পরিচয় দিত। ক্রীড়াযুদ্ধে বীরত্বের পরীক্ষা মধ্যযুগের বড়লোকদের সামাজিক জীবনের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল।

বড়লোকদের বাড়ীকে বলা হইত 'Manor House' বা খাস খামারের মধ্যবর্তী প্রাসাদ। এই প্রাসাদে একটি খুব বড় খাবার ঘর (dining hall) থাকিত, তাহার চারি পাশে কতকগুলি শুইবার ঘর। বাড়ীর চারিদিকে বাড়ীর মালিকের

খাস জমি ; এই জমি চাষ করিত দাস শ্রেণীর প্রজারা। সাধারণতঃ যে অঞ্চলে বেশী যুদ্ধবিগ্রহ হইত না সেখানেই বড়লোকেরা Manor Houseএ বাস করিতেন। বাড়ীগুলি কাঠের তৈরী, দেয়ালে ছবি-আঁকা পর্দা। ঘরের ভিতরে



ফ্রান্সের একটি Manor House

আলো-বাতাস ঢুকিত না বলিলেই চলে। মোমবাতি ও মশাল জ্বালিয়া অন্ধকার দূর করা হইত। বড় বড় ভোজে অনেক লোকের নিমন্ত্রণ হইত, আস্ত ষাঁড় ও শূকর সিদ্ধ করিয়া অতিথিদিগকে দেওয়া হইত। আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থাও ছিল। ভাঁড়েরা হাসির খোরাক জোগাইত। চারণেরা বীরত্বের গাথা গাহিয়া শুনাইত। কুস্তিগীরেরা ব্যায়ামের কৌশল দেখাইত।

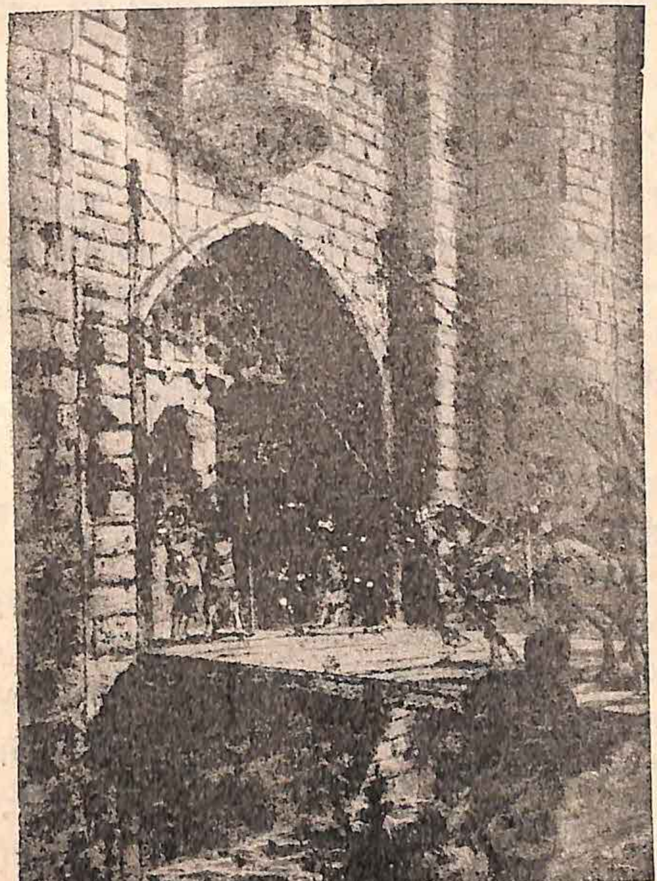
যে অঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহ বেশী হইত সেখানে বড়লোকেরা বিপদ হইতে মুক্ত থাকিবার জন্য দুর্গে বাস করিতেন। পাথরের

তৈরী দুর্গ, পুরু এবং উঁচু দেয়ালে ঘেরা। দেয়ালের বাহিরে জলে ভরা পরিখা। বড় জানালা রাখা হইত না, দেয়ালে ছোট ছোট গর্ত কাটিয়া জানালার কাজ চলিত। দুর্গতোরণে যে দরজা থাকিত তাহা টানিয়া তোলা এবং নামান যাইত। পরিখা পার হইবার জন্য যে সেতু রাখা হইত তাহাও টানিয়া তোলা এবং নামান যাইত। শত্রু যাহাতে দুর্গে প্রবেশ করিতে না পারে তাহার জন্য নানারকম সতর্কতা অবলম্বন করা হইত।

জনসংখ্যার অধিকাংশই ছিল কৃষক। তাহারা জমি চাষ করিয়া জীবিকানির্বাহ করিত। কৃষকদের মধ্যে দুই শ্রেণী ছিল। যাহারা বিপদে সাহায্য লাভের জন্য জমিদারদিগকে উৎপন্ন শস্যের অংশ দিত এবং তাঁহাদের বিনা মজুরীতে বৎসরে কয়েকদিন পরিশ্রম করিত তাহাদিগকে স্বাধীন প্রজা (freemen) বলা হইত। জমিদারদের আইনসঙ্গত দাবি শোধ করিলে তাহারা ব্যক্তিগত ব্যাপারে ইচ্ছামত কাজ করিতে পারিত। আর এক শ্রেণীর প্রজার এই স্বাধীনতা ছিল না। তাহাদিগকে দাস (serfs) বলা হইত। তাহারা জমিদারের জমি চাষ করিত। জমিদারের বিনা অনুমতিতে তাহারা জমি ছাড়িয়া যাইতে পারিত না।

গ্রামের লোকদের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল জিনিস গ্রামেই উৎপন্ন হইত; বাহিরের বৃহত্তর জগতের সহিত গ্রামের যোগাযোগ ছিল না বলিলেই চলে। গ্রামের মধ্যে চাষের উপযোগী সমস্ত জমি একসঙ্গে চাষ করা হইত, আজকাল যেমন টুকরা টুকরা করিয়া ভাগ করিয়া পৃথক ভাবে চাষ করা

হয় তাহা করা হইত না। জমির এক একটি অংশ এক একজন কৃষকের জন্য নির্দিষ্ট থাকিত, কিন্তু তাহা পাশের জমি হইতে বেড়া দিয়া পৃথক করা হইত না।



মধ্য যুগের দুর্গ

কৃষকেরা দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন যাপন করিত। তাহাদের জিনিসপত্র সামান্যই থাকিত। কয়েকটি শূকর, একটি দুগ্ধবতী গাভী, কয়েকটি ষাঁড়—সাধারণত কৃষকের ঘরে এগুলি মূল্যবান সম্পত্তি রূপে গণ্য হইত। ধনবান কৃষকের গৃহে একটি ঘোড়া থাকিত।

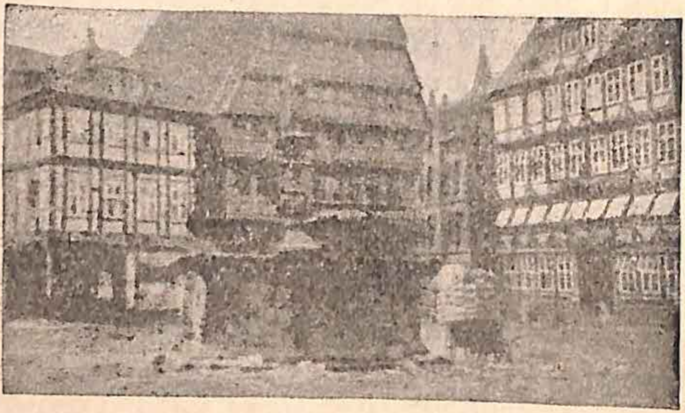
দরিদ্র কৃষকেরা সাধারণতঃ শাক-সব্জী খাইয়া জীবনরক্ষা করিত। মাংস তাহাদের ভাগ্যে কমই জুটিত। শীতের সময় মাংসের মত গরম খাদ্যের বড় প্রয়োজন। তাই শীতকালের জন্য মাংসে লবণ মাখাইয়া রাখা হইত, কারণ লবণমাখা মাংস সহজে পচিয়া যায় না। শাক-সব্জীর সঙ্গে কৃষকদের জুটিত খারাপ রুটি আর টক মদ। শীতপ্রধান দেশে মদের প্রচলন বেশী। শীত হইতে শরীর রক্ষার জন্য কৃষকেরা চামড়া বা পশমে তৈরী থলির মত জামা পরিত। মেয়েরা সেলাই ও বোনার কাজে অনেক সময় কাটাইত।

কৃষকদের কুটিরগুলি সাধারণতঃ কাঠের তৈরী; সময় সময় পাথরের তৈরী বাড়ীতেও তাহারা বাস করিত। ঘরের জানালাগুলি খুব ছোট রাখা হইত, যেন ঠাণ্ডা হাওয়া বেশী ঢুকিতে না পারে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই একটি গির্জা থাকিত। গির্জার পুরোহিত গ্রামের কৃষকদের মতই দরিদ্র, লেখাপড়াও তাঁহার বেশী জানা ছিল না। তবু গির্জায় উপাসনা এবং ধর্ম সংক্রান্ত নানারকম উৎসব পরিশ্রান্ত কৃষকদের জীবনে খানিকটা আনন্দের খোরাক জোগাইত।

মধ্য যুগে ইউরোপে অনেক শহর গড়িয়া উঠিয়াছিল। অবশ্য সেগুলি আজকালকার শহরের মত এত বড় ছিল না, এত জাঁকজমক এবং ঐশ্বর্যের ছড়াছড়িও তখন ছিল না। শহরে সেকালেও লোকের ঘন বসতি ছিল। শহরের চারিদিকে শত্রুর আক্রমণ রোধ করিবার জন্য সুদৃঢ় প্রাচীর, শহর হইতে বাহির হইবার জন্য কয়েকটি সুরক্ষিত তোরণ। শহরের মধ্যে সরু গলি, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ। এখানে-ওখানে সরাই, বাজার, মেলা। শহরে চোর ও গুণ্ডাজাতীয় লোকের অভাব নাই। তাহাদের উপদ্রব হইতে শহরবাসীকে রক্ষা করিবার জন্য রাত্রিতে পাহারার বন্দোবস্ত রহিয়াছে। পাহারা-দারেরা বাঁশের ডগায় মশাল বাঁধিয়া গভীর রাত্রিতে শহরের সরু গলিতে চলাফেরা করে, হাঁক-ডাক করিয়া শহরবাসীকে সতর্ক করে।

শহরে বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের বাস। শহরের শাসনভার অল্ডারম্যান (Alderman), মেয়র (Mayor) প্রভৃতির উপর। সাধারণতঃ ধনী ব্যক্তিরাই এই সকল পদ অধিকার করিতেন, কারণ শহরবাসীদের উপর তাঁহাদের যথেষ্ট প্রতিপত্তি থাকিত। তাঁহারা জমকালো পোষাক পরিতেন, বড়লোকী চালে চলিতেন। বড়লোকদের মধ্যে অনেকেই বণিক, ব্যবসায়-বাণিজ্যে তাঁহাদের প্রচুর আয় হইত। শহরগুলি শিল্পের কেন্দ্রস্থল, সুতরাং শহরে নানারকম শিল্পীর বাস। কৃতী শিল্পীদের সঙ্গে থাকিত বহু শিক্ষানবিশ। হাতে কলমে শিক্ষার মধ্য দিয়া শিল্পকৌশল বাঁচিয়া থাকিত। শিল্পীদের এবং

বণিকদের পৃথক সঙ্ঘ ছিল। যেমন, যাহারা কাপড় বুনিত তাহাদের একটি সঙ্ঘ, যাহারা লোহার কাজ করিত তাহাদের একটি সঙ্ঘ, আবার যাহারা বিদেশী মশলা বিক্রয় করিত তাহাদের একটি সঙ্ঘ, ইত্যাদি। সঙ্ঘ যে সকল নিয়ম করিয়া



শহরের একটি বাজার

দিত সেগুলি সেই সঙ্ঘের প্রত্যেক সভ্যকে পালন করিতে হইত। এইজন্য ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সঙ্ঘগুলির যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

কোন কোন শহর রাজার বা বড়লোকদের সনদ লইয়া নানারকম রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করিত। নিজেদের শাসনকার্যের জন্য যে আইন প্রয়োজন তাহা শহরের কর্তৃপক্ষই রচনা করিতেন। আবার মুদ্রা নির্মাণের অধিকারও তাঁহাদের থাকিত। স্বায়ত্তশাসনের এতখানি অধিকার

আজকালকার সব চেয়ে বড় শহরগুলিকেও দেওয়া হয় না। মধ্য যুগে ইটালী ও জার্মানীর কয়েকটি শহর প্রায় স্বাধীন রাজ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের সৈন্যসামন্ত ও যুদ্ধজাহাজ থাকিত, তাহারা অন্যান্য রাজ্যের সহিত প্রয়োজনমত যুদ্ধ বা সন্ধি করিত। এই রকম কোন শহরে কয়েকটি ধনী পরিবার রাজবংশের মত ক্ষমতা ও মর্যাদা অধিকার করিয়াছিল।

মধ্যযুগের সমাজে পুরোহিতদের খুব সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। সেকালে লেখাপড়া জানা লোক বলিতে পুরোহিত-দিগকেই বুঝাইত, কারণ জমিদারেরা এবং বণিকেরা শিক্ষালাভের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিত না। সাধারণতঃ পুরোহিতরা বিবাহ করিতেন না; সংসারের দায়িত্ব হইতে মুক্ত থাকিয়া ধর্মের সেবা করাই তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য ছিল। নিম্ন শ্রেণীর পুরোহিতেরা গ্রাম অঞ্চলে সাধারণ লোকের সঙ্গে বাস করিতেন, তাহাদের ধর্মজীবন পরিচালনা করিতেন। একটি অঞ্চলের বা জেলার পুরোহিতদের অধ্যক্ষকে 'বিশপ' (Bishop) বলা হইত। কালক্রমে অনেক পুরোহিত ও 'বিশপ' সম্পত্তি অধিকার করিয়া ধনবান হইয়াছিলেন।

পুরোহিতদের মধ্যে আর এক দল মঠে বাস করিতেন তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসী (Monk) বলা হইত। স্ত্রীলোকেরাও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া আলাদা মঠে বাস করিতেন। প্রত্যেক মঠের একজন অধ্যক্ষ থাকিতেন। পুরুষদের মঠের (Monastery) অধ্যক্ষ (Abbot) হইতেন পুরুষ, স্ত্রীলোকদের মঠের (Nunnery) অধ্যক্ষ হইতেন স্ত্রীলোক (Abbess)। মঠের

অধ্যক্ষ যে সকল নিয়ম প্রবর্তন করিতেন তাহা সকল সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসিনীকে পালন করিতে হইত। মঠবাসীরা নিয়মিত ভাবে উপাসনা ও অধ্যয়ন করিতেন। সময় সময় তাঁহাদিগকে মৌনব্রত অবলম্বন করিতে হইত। তাঁহারা আসল জীবন যাপন করিতেন না। মঠের সমুদয় প্রয়োজনীয় জিনিস মঠেই উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা থাকিত। কালক্রমে 'বিশপ'দের মত মঠবাসী সন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে ধনসম্পত্তি সঞ্চয় করিয়া ভোগে লিপ্ত হইলেন, ত্যাগ ও তপস্যার আদর্শ তাঁহাদের মনে স্থান পাইল না।



মঠে সন্ন্যাসী পুঁথি নকল করিতেছেন

সকল মঠের যে এইরূপ অবনতি হইয়াছিল তাহা নহে। কোন কোন মঠ শিক্ষাদান ও জ্ঞানচর্চার প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। সন্ন্যাসীদের মধ্যে কয়েকটি সম্প্রদায় সাধারণ গরীবদের মধ্যে ধর্মপ্রচার করিত, দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য চেষ্টা করিত। তাঁহাদিগকে 'ভ্রাতা' (Friar) বলা হইত।

'বর্বর' জাতিগুলির আক্রমণ ও রাজ্যস্থাপনের যুগে ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা লোপ পাইয়াছিল, ইউরোপের

সভ্যতার ইতিহাসে অন্ধকারের যুগ আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে 'বর্বর' জাতিরা সভ্য হইল, তাহারা শিক্ষার মর্যাদা বুঝিল। আবার ইউরোপে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আরম্ভ হইল। ইহার প্রধান কেন্দ্র হইল কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়। ছাত্র এবং শিক্ষকের সম্মিলনে বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত হইত। কোন কোন বিষয়ে সন্ন্যাসীদের মঠের সহিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাদৃশ্য ছিল। অনেক সময় কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের খ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িত। তখন তাঁহার কাছে শিক্ষালাভ করিবার জন্য নানা দেশ হইতে বহু ছাত্র সমবেত হইত। এইরূপে একজন বড় পণ্ডিতকে কেন্দ্র করিয়া একটি বিশ্ববিদ্যালয় গড়িয়া উঠিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার সকলের জন্যই উন্মুক্ত ছিল; যে কোন দেশের লোক বিদ্যালাভের জন্য উৎসুক হইলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারিত।



বড়লোকদের ছেলেদের বিদ্যালয় : একটি ছাত্রকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে

সময় সময় শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন বিদ্যায় সুশিক্ষিত হইবার জন্য পর পর বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করিত। কোন কোন বিষয় অধ্যাপনার জন্য কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ খ্যাতি ছিল। সিসিলির অন্তর্গত স্যালার্ণো (Salerno) বিশ্ববিদ্যালয়ে

চিকিৎসা বিদ্যা শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল। ইটালীর অন্তর্গত বোলোনা (Bologna) বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন শিক্ষার দিকে বেশী নজর দেওয়া হইত। ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মশাস্ত্র ভাল করিয়া পড়ানো হইত। ইংলণ্ডে দুইটি বিশ্ববিদ্যালয় ছিল—অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ। প্যারিস, অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজ এখনও উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্র রূপে সমগ্র পৃথিবীতে সুপরিচিত।

সেকালের ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যবর্তী ছাত্রাবাসে থাকিত। ইহাতে ছাত্রদের পরস্পরের সহিত মিশিবার এবং আলাপ-আলোচনার সুযোগ হইত, শিক্ষকদের সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকিত। আবার বিভিন্ন অঞ্চলের ছাত্রেরা পৃথক ভাবে আঞ্চলিক সমিতি গঠন করিত। এইরূপ সমিতিকে বলা হইত 'জাতি' ('nation')। যেমন, প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের স্পেনীয় ছাত্রেরা একটি 'জাতি', ইটালীয় ছাত্রেরা আর একটি 'জাতি'। কিন্তু এইরূপ ভাবে 'জাতি গঠন সমগ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ঐক্যবোধ বিনষ্ট করিতে পারে নাই। সকল 'জাতি'র ছাত্রেরাই একরকম পোষাক পরিত, নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবে গর্ব বোধ করিত। প্রয়োজন হইলে সকল 'জাতি'র ছাত্রেরা সম্মিলিত হইয়া শহরবাসীদের সহিত ঝগড়া ও মারামারি করিত। সমাজ-জীবনে বিশ্ববিদ্যালয় একটি জীবন্ত প্রতিষ্ঠান ছিল।

মধ্য যুগের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ইতিহাসে কয়েকজন বড় বড় পণ্ডিতের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অ্যাবেলার্ড (Abelard) ফ্রান্সের একটি সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার শিক্ষালাভ

ও শিক্ষাদানের কেন্দ্র ছিল প্যারিস। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বহু দুঃখ-কষ্ট ও মর্মবেদনা সহ্য করেন, কিন্তু জ্ঞানের সাধনায় তাঁহার উৎসাহ কখনও ম্লান হয় নাই। মধ্য যুগের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে তিনি একজন। তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দীর্ঘকাল মঠে বাস করেন।

সেকালের আর একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত 'মহান্' আলবার্ট (Albertus Magnus) ছিলেন জার্মান। তিনি জার্মানীর নানা স্থানে এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেন। অ্যারিস্টটলের লেখা বইগুলির টীকা রচনা করিয়া তিনি ইউরোপে প্রাচীন গ্রীক দর্শন ও বিজ্ঞানের চর্চা নূতন ভাবে আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রধান শিষ্য টমাস্ অ্যাকুইনাস্ (Thomas Aquinas) জাতিতে ইটালীয় ছিলেন। তিনি নেপ্‌ল্‌স্ এবং প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়া পরে প্যারিসে অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। তিনি অল্পবয়সে সন্ন্যাসী হইয়াছিলেন। ধর্মশাস্ত্র ও দর্শন সম্বন্ধে তাঁহার লেখা অনেক বই আছে।

সেকালের ইংরেজ পণ্ডিতদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রোজার বেকন (Roger Bacon) অক্সফোর্ড ও প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। ধর্মশাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও তিনি বিজ্ঞান-চর্চায় উৎসাহী ছিলেন। তাঁহাকে মধ্য যুগের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক বলা যাইতে পারে।

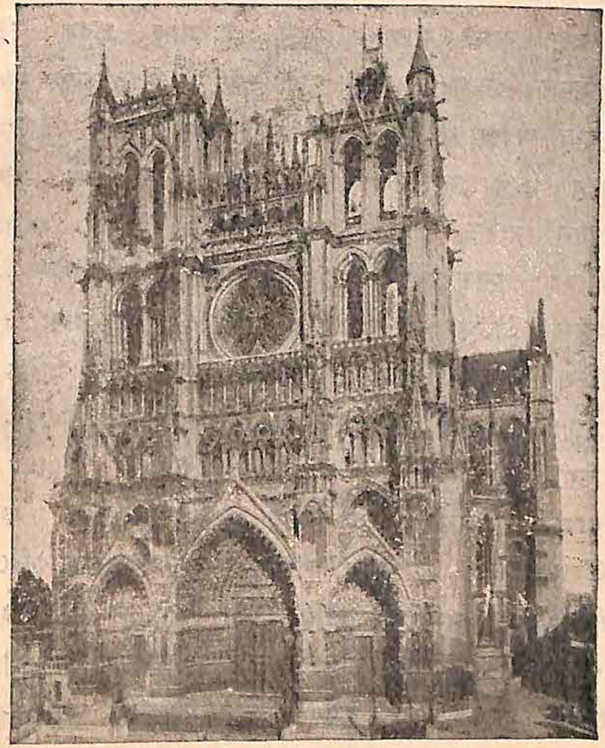
মধ্য যুগের পণ্ডিতেরা ধর্মশাস্ত্র ও দর্শনের বেশী চর্চা করিতেন, ল্যাটিন ভাষায় বই লিখিতেন। কিন্তু সাহিত্য রচনা কেবল

পণ্ডিতদের ভাষায় সীমাবদ্ধ ছিল না; সাধারণ লোক যে সকল ভাষায় কথাবার্তা বলিত সেই সকল ভাষাতেও সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছিল। এই নূতন সাহিত্যের বিষয়বস্তু ছিল বিভিন্ন দেশের বড় বড় রাজা ও যোদ্ধার বীরত্বের কাহিনী। এই সকল কাহিনী ঐতিহাসিক ঘটনা অবলম্বন করিয়া লেখা হইত বটে; কিন্তু অনেক সময় কাল্পনিক ঘটনা যোগ করা হইত। সেকালের চারণেরা এই সকল কাহিনী বড়লোকদের দরবারে গাহিয়া বেড়াইত। ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডে চারণদের বলা হইত 'minstrel', ফ্রান্সে তাহাদের নাম ছিল 'troubadours', আর জার্মানীতে তাহাদিগকে বলা হইত 'minnesingers'।

প্রাচীন ব্রিটেনের রাজা আর্থার সম্বন্ধে চারণদের গান ও কাব্য ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে খুব প্রচলিত ছিল। পরে ইহা জার্মানী, ইটালী ও স্পেন দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। দরিদ্রের বন্ধু রবিন হুডের বীরত্ব-কাহিনী ইংলণ্ডের লোকের খুব প্রিয় ছিল। শার্লামেনের সেনানায়ক রোল্যাণ্ডের কাহিনী তোমাদিগকে পূর্বেই বলা হইয়াছে।

ক্রমে জনসাধারণের কথ্য ভাষা উঁচু দরের সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিল। মহাকবি দান্তে (Dante) ইটালীয় ভাষায় প্রসিদ্ধ মহাকাব্য 'Divine Comedy' রচনা করিলেন। ইংলণ্ডের কবি (Chaucer) ইংরেজী ভাষায় 'Canterbury Tales' নামক সুমধুর কাব্য লিখিলেন। ধীরে ধীরে ল্যাটিন ভাষার প্রভাব কমিয়া গেল। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কথ্য ভাষায় বড় বড় কাব্য-নাটক লেখা হইতে লাগিল।

মধ্য যুগের সংস্কৃতি কেবল সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশিত হয় নাই, শিল্পেও তাহার প্রকাশ বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সেকালে ইউরোপের নানা দেশে অনেক বড় বড় গির্জা নির্মাণ



ফ্রান্সে অ্যামিয়েন্সের ক্যাথিড্রাল—গথিক রীতিতে তৈরী

করা হয়। এই সকল গির্জার গঠন-কৌশল ও কারুকার্য অতি চমৎকার। যে রীতিতে এগুলি নির্মিত হইত তাহাকে

'গথিক' রীতি বলা হয়, যদিও গথ জাতির সহিত ইহার কোনরকম সম্বন্ধ নাই। ফ্রান্সের অন্তর্গত রীম্‌স্ (Rheims) এবং অ্যামিয়েন্স (Amiens) শহরের সুবৃহৎ গির্জা (Cathedral) 'গথিক' শিল্প-রীতির প্রসিদ্ধ কীর্তি।

মধ্য যুগের মানুষের মনে ধর্মবিশ্বাস প্রবল ছিল। উপাসনায় যোগদান করা, তীর্থভ্রমণ করা প্রভৃতি সাধারণ মানুষের অবশ্য করণীয় কর্তব্যের মধ্যে গণ্য হইত। খ্রীষ্টানদের প্রধান তীর্থ জেরুজালেম। ইউরোপ হইতে বহু তীর্থযাত্রী সেখানে যাইত। শেষে প্যালেস্টাইন ইসলাম ধর্মাবলম্বী তুর্কীদের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। তুর্কীদের নূতন ব্যবস্থায় খ্রীষ্টান তীর্থযাত্রীদের নানারকম অসুবিধা হইতে লাগিল। তখন ইউরোপের খ্রীষ্টানদের মনে হইল যে তুর্কীদের হাত হইতে জেরুজালেম প্রভৃতি পবিত্র তীর্থস্থানগুলি কাড়িয়া লইতে হইবে। সন্ন্যাসী পিটার (Peter the Hermit) নামক এক সাধু জনসাধারণকে ধর্মযুদ্ধে (Crusade) যোগদান করিবার জন্য আহ্বান করিলেন। ধর্মগুরু পোপ ধর্মযুদ্ধের দাবি সমর্থন করিলেন। ইউরোপের নানা দেশ হইতে হাজার হাজার কৃষক ধর্মযুদ্ধে যোগদান করিল। অনেক বড় বড় জমিদার সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া ধর্মযুদ্ধের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিলেন। বড় বড় যোদ্ধারা ধর্মযুদ্ধে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন।

ইউরোপের খ্রীষ্টান এবং এশিয়ার তুর্কী মুসলমানদের মধ্যে ধর্মযুদ্ধ দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। ইউরোপের কয়েকজন বড় বড়

রাজা এশিয়ায় যাইয়া যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজা প্রথম রিচার্ড প্রসিদ্ধ একর (Acre) দুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু তিনি জেরুজালেম জয় করিতে পারেন নাই। তাঁহার সাহস ও বীরত্বের জন্য সেকালের লোক তাঁহাকে 'সিংহপ্রাণ'

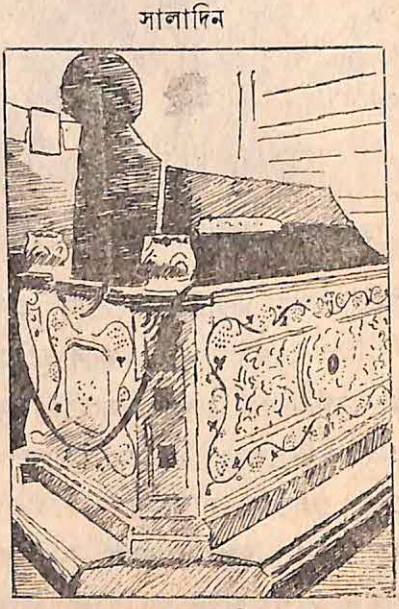


ক্রুসেড : খ্রীষ্টান যোদ্ধাদের যুদ্ধযাত্রা

(Lion-hearted) আখ্যা দিয়াছিল। সম্রাট প্রথম ফ্রেডারিক এশিয়ায় যুদ্ধ করিতে যাইয়া নদীর জলে ডুবিয়া মারা যান। সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক এশিয়ায় যাইয়া যুদ্ধ না করিয়াই জেরুজালেম হস্তগত করেন। ধর্মযুদ্ধে খ্রীষ্টানদের প্রবল শত্রু ছিলেন তুর্কীদের সুলতান সালাদিন। তিনি মিশর হইতে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করিয়া এক বিশাল তুর্কী সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।



সালাদিন



দামাস্কাসে সালাদিনের কবর

ধর্মযুদ্ধে দুই পক্ষেরই বার বার হারজিত হইয়াছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টানেরা তুর্কীদের হাত হইতে এশিয়ার তীর্থস্থানগুলি অধিকার করিতে পারে নাই। তবু এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতার সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া ইউরোপীয়



'ক্রুসেড' : খ্রীষ্টানদের সহিত মুসলমানদের যুদ্ধ

খ্রীষ্টানেরা অনেক নূতন বিষয় শিখিয়াছিল। খাদ্য, পোষাক, সাজসজ্জা প্রভৃতি বিষয়ে এশিয়ার কোন কোন রীতি ইউরোপে প্রচলিত হইল। ধর্মযুদ্ধের ফলে ইউরোপের লোক মসলা ও চিনি খাইতে শিখিল, লম্বা ঢিলা পোষাক পরিতে এবং দাড়ি রাখিতে লাগিল। দুর্গ নির্মাণ, নূতন ধরণের অস্ত্র ও বর্ম ব্যবহার প্রভৃতি নানা বিষয়ে ইউরোপ এশিয়ার কাছে শিক্ষা পাইল।

এশিয়ার নানারকম উপাখ্যান ইউরোপের সাহিত্যে স্থান পাইল। যুদ্ধ ও বাণিজ্যের মধ্য দিয়া প্রাচ্য ভূখণ্ডের সহিত পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডের নূতন পরিচয় হইল।

খ্রীষ্টাব্দ
—১০৯৬ প্রথম ধর্মযুদ্ধ (First Crusade)
—১১৪২ অ্যাবেলার্ডের মৃত্যু
—১১৯০ এশিয়ায় সম্রাট প্রথম ফ্রেডারিকের মৃত্যু
—১১৯১ 'সিংহপ্রাণ' রিচার্ড কর্তৃক একর দুর্গ জয়
—১১৯৩ সালাদিনের মৃত্যু
—১২২৯ সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের ধর্মযুদ্ধ
—১২৭৪ টমাস অ্যাকুইনাসের মৃত্যু
—১২৮০ 'মহান্' আলবার্টের মৃত্যু
—১৩২১ দান্তের মৃত্যু
—১৪০০ চসারের মৃত্যু

অষ্টম অধ্যায়

ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্য

খলিফা সাম্রাজ্যের পতন

বাগ্‌দাদের আব্বাস বংশীয় খলিফারা যে বিশাল সাম্রাজ্যে রাজত্ব করিতেন তাহার কথা তোমাদিগকে পূর্বেই বলা হইয়াছে। ক্রমশঃ এই বিশাল সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া পড়ে, ইহার বিভিন্ন অংশে ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্যের উৎপত্তি হয়। সাম্রাজ্যের পশ্চিম অংশে যে সকল রাজ্য স্থাপিত হয় তাহাদের মধ্যে

অধিকাংশই আরব জাতীয় শাসকগণের অধীন ছিল। স্পেনের আরব রাজাদের কথা তোমরা পড়িয়াছ। তাঁহারা বাগ্‌দাদের খলিফার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া 'খলিফা' উপাধি গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া উত্তর আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে কয়েকটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। আব্বাস বংশীয় খলিফাদের সাম্রাজ্যের পূর্ব অংশে যে সকল নূতন রাজ্যের উৎপত্তি হয় তাহাদের শাসকেরা প্রধানতঃ তুর্কী বা পারসিক ছিলেন। পারস্য, মধ্য এশিয়া এবং আফগানিস্তান এই সকল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

মধ্য যুগে এশিয়ার ইতিহাসে তুর্কীরা প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। তাহারা পারসিক প্রভৃতি জাতির অনেক পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, তাহাদের রাজনৈতিক প্রতিপত্তি খলিফাদের পতনের যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়। তুর্কীদের স্থাপিত রাজ্যগুলির মধ্যে আফগানিস্তানের অন্তর্গত গজনী রাজ্যের সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা আল্‌প্তিগীন প্রথম জীবনে সামান্য ক্রীতদাস ছিলেন। গজনীর সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত অধিপতি সুলতান মামুদ ১৭ বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি উত্তর ভারতের বড় বড় শহরগুলি লুণ্ঠন করিয়া প্রচুর ধনরত্ন গজনীতে লইয়া যান। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পঞ্জাব তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে তিনি রাজ্যবিস্তার করিতে পারেন নাই। মহাপণ্ডিত অল-বীরূণি এবং কবি ফির্দৌসী তাঁহার সভাসদ ছিলেন। অল-বীরূণির কথা তোমরা পড়িয়াছ। ফির্দৌসীর লেখা 'শাহ্‌নামা' ফারসী ভাষার একটি প্রসিদ্ধ মহাকাব্য।

তুর্কী জাতি বিভিন্ন শাখায় বিভক্ত ছিল। সব চেয়ে শক্তিশালী ছিল তুর্কীস্তানের আদি অধিবাসী সেল্‌জুক শাখা। সেল্‌জুক নামে এক বীর এই শাখার প্রথম পরাক্রান্ত অধিনায়ক ছিলেন। তাঁহার নাম অনুসারে ইহার নামকরণ হইয়াছিল। সেল্‌জুক তুর্কীরা মধ্য এশিয়া হইতে পশ্চিম এশিয়ায় যাইয়া আব্বাসবংশীয় খলিফাদের সাম্রাজ্যের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করে। এক সময়ে মধ্য এশিয়া হইতে প্যালেস্টাইন ও মিশর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল তাহাদের অধীন ছিল। তাহারা কেবল যুদ্ধে ও রাজ্যশাসনে কৃতিত্ব দেখায় নাই, সভ্যতার উন্নতির প্রতি তাহাদের বেশ দৃষ্টি ছিল। ইউরোপীয় খ্রীষ্টানদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধে (Crusade) সেল্‌জুক তুর্কীদের নায়ক ছিলেন মহাবীর সালাদিন।

ক্রমশঃ সেল্‌জুক সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িল, ইহার পূর্বভাগে—মধ্য এশিয়া অঞ্চলে—আর একটি পরাক্রান্ত তুর্কী রাজবংশের উৎপত্তি হইল। এই বংশের রাজারা 'খ্বারিজম্ শাহ' নামে পরিচিত। আফগানিস্তানের অন্তর্গত ঘূর রাজ্যের তুর্কী শাসকেরা একসময় খ্বারিজম্ শাহের অধীন ছিলেন। ঘূর রাজ্যের সেনাপতি মহম্মদ ঘূরী উত্তর ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

ভারতে মুসলমান আক্রমণ

ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণ বহুদিন পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল। মহম্মদের মৃত্যুর পর আশী বৎসর যাইতে না যাইতেই আরবেরা ভারতের পশ্চিম সীমান্তে সিন্ধুদেশ

অধিকার করে। সিন্ধুদেশে আরবদের শাসন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইলেও তাহারা ভারতের আর কোন প্রদেশ জয় করিতে পারে নাই। আরব শাসনকালে সিন্ধুদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হয়, কিন্তু ভারতের অভ্যন্তরে এই নব ধর্ম প্রবেশ করিতে পারে নাই।

সিন্ধু দেশ আরবদের অধিকারে আসিবার তিনশত বৎসর পরে গজনীর সুলতান মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং পঞ্জাব অধিকার করেন। তখনও সিন্ধুদেশ আরবদের অধীন ছিল, কিন্তু উত্তর ভারতের অন্যান্য প্রদেশ এবং সমগ্র দক্ষিণ ভারতে হিন্দু রাজারা স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতেছিলেন।

সুলতান মামুদের বংশধরদের আমলে গজনী রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িল, আফগানিস্তানে ঘূর নামে আর একটি তুর্কীরাজ্য স্থাপিত হইল। এই রাজ্যের রাজার ভাই মুইজউদ্দীন মহম্মদ ভারতবর্ষের ইতিহাসে মহম্মদ ঘূরী নামে পরিচিত। ঘূর রাজ্যের সৈন্যদলের নায়ক রূপে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া তিনি উত্তর ভারতে তুর্কী সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন।

মহম্মদ ঘূরী প্রথমে গুজরাট অধিকার করিতে যাইয়া সেখানকার রাজপুত রাজার কাছে পরাজিত হইলেন। তারপর তিনি সুলতান মামুদের বংশধরদিগকে পরাজিত করিয়া পঞ্জাব অধিকার করেন। তখন তাঁহার দৃষ্টি পড়িল দিল্লীর দিকে। দিল্লী ও আজমীরের চৌহান বংশীয় রাজপুত রাজা পৃথ্বীরাজ তখন শক্তিতে ও ঐশ্বর্যে উত্তর ভারতের রাজাদের

মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন কনৌজের রাঠোর বংশীয় রাজপুত রাজা জয়চ্চন্দ্র। উত্তর ভারতের এই দুইজন প্রধান রাজার মধ্যে বিবাদের সুযোগ লইয়া মহম্মদ ঘূরী রাজ্যবিস্তারে অগ্রসর হইলেন। দিল্লীর নিকটে তরাইন নামক স্থানে তাঁহার সহিত পৃথ্বীরাজের দুইবার যুদ্ধ হইল। প্রথম যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের জয় হইল; দ্বিতীয় যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। দিল্লীতে মুসলমানদের অধিকার স্থাপিত হইল। দুই বৎসর পরে তাহারা জয়চ্চন্দ্রকে পরাজিত ও নিহত করিয়া কনৌজ দখল করিল।

দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য

মহম্মদ ঘূরীর সেনাপতি কুতবউদ্দীন আইবক ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপনে তাঁহাকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। প্রভুর অনুপস্থিতিকালে আইবক দিল্লীতে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিতেন। মহম্মদ ঘূরীর মৃত্যুর পর তিনি দিল্লীর সুলতান হইলেন। দিল্লী ভারতে মুসলমান সাম্রাজ্যের রাজধানী হইল, ঘূর ও গজনী রাজ্যের সহিত ভারতের সম্বন্ধ ছিন্ন হইল।

কুতবউদ্দীন নিজে প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর যাঁহারা সুলতান হন তাঁহাদের মধ্যে দুইজন (ইলতুৎমিস ও গিয়াসউদ্দীন বলবন) ক্রীতদাস রূপে জীবন আরম্ভ করেন। এইজন্য কুতবউদ্দীনের প্রতিষ্ঠিত রাজবংশকে 'দাস বংশ' বলা হয়। সেকালে মুসলমান সমাজে কোন ক্রীতদাসের বুদ্ধি ও বাহুবল থাকিলে সে সর্বোচ্চ পদ লাভ করিতে পারিত।

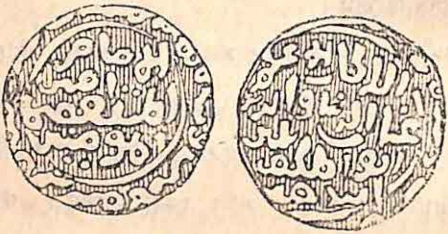
দাস বংশীয় সুলতানেরা ৪৮ বৎসর দিল্লীতে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের সময়ে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে দিল্লীর আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। মধ্য এশিয়ার দুর্দান্ত মোঙ্গলেরা বারবার ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে হানা দিয়াও এই দেশ ছার-খার করিতে পারে নাই। দিল্লীর সুলতানেরা সীমান্ত রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

কুতবউদ্দীনের পরে সিংহাসন লাভ করেন তাঁহার জামাতা ইল্‌তুৎমিস। তিনি সামান্য ক্রীতদাসের পদ হইতে নিজের প্রতিভাবলে রাজপদ লাভ করেন। তিনি কয়েকটি যুদ্ধে জয়-লাভ করিয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার কন্যা রিজিয়া কিছুকাল রাজত্ব করেন। তিনি পুরুষের মত দরবারে বসিয়া শাসনকার্য চালাইতেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্য পরিচালনা করিতেন। কিন্তু মুসলমান আমীরগণ নানা কারণে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়া বিদ্রোহী হইলেন। রিজিয়া বিদ্রোহীদের হাতে প্রাণ হারাইলেন। সেকালের একজন লেখক দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, রিজিয়া নারী ছিলেন বলিয়াই তাঁহার অত গুণ ব্যর্থ হইয়া গেল। রিজিয়া ছাড়া আর কোন নারী তাঁহার পূর্বে বা পরে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন নাই।

রিজিয়ার পরে তাঁহার ভাই নাসিরউদ্দীন দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। তিনি শান্তিপ্রিয় ও ধর্মপ্রাণ সুলতান ছিলেন, যুদ্ধবিগ্রহের চেয়ে লেখাপড়া তাঁহার অনেক বেশী প্রিয় ছিল। তিনি সাদাসিধা সরল জীবন যাপন করিতেন। কোরাণ নকল

করিয়া তাঁহার যে সামান্য আয় হইত তাহাতেই নাকি তাঁহার ব্যক্তিগত খরচ নির্বাহ হইত। তাঁহার সময়ে রাজ্যশাসনের ভার ছিল তাঁহার শ্বশুর ও মন্ত্রী গিয়াসউদ্দীন বলবনের উপর।

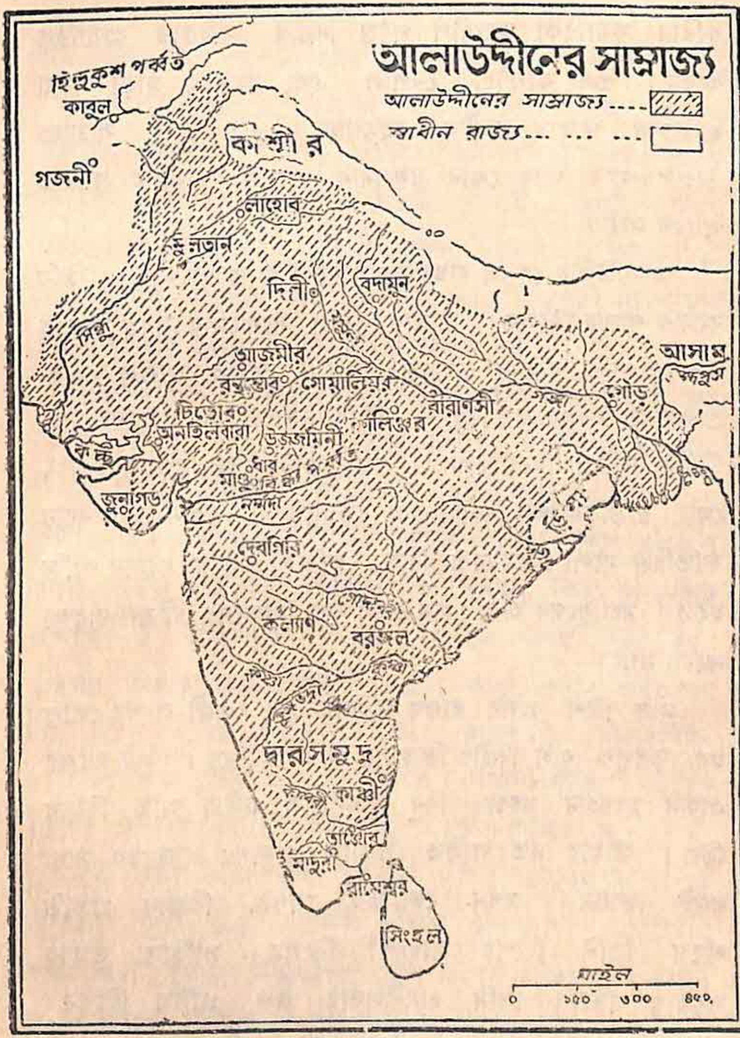
বলবন প্রথম জীবনে ইল্‌তুৎমিসের ক্রীতদাস ছিলেন। যুদ্ধ ও শাসনকার্যে তাঁহার সমান দক্ষতা ছিল। নাসিরউদ্দীনের



বলবনের মুদ্রা

মৃত্যুর পর বলবন নিজেই সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার কঠোর শাসনে দেশে শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হয়। মোঙ্গলদের সহিত যুদ্ধে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ বয়সে এই নিদারুণ শোকে বলবনের দেহ ও মন একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল।

বলবনের মৃত্যুর কিছুকাল পরে দিল্লীতে দাস বংশের অধিকার লোপ পাইল। নূতন রাজবংশের নাম খলজী বংশ। এই বংশের শ্রেষ্ঠ সুলতান আলাউদ্দীন খলজী। তাঁহার মত সাহসী, কর্মদক্ষ এবং ক্ষমতাশালী সুলতান দিল্লীতে আর কখনও রাজত্ব করেন নাই। দাস বংশের সুলতানের অধিকার উত্তর ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল; তাঁহারা কখনও দক্ষিণ ভারতে রাজ্যবিস্তারের চেষ্টা করেন নাই। আলাউদ্দীন বারবার দক্ষিণ ভারত আক্রমণ



আলাউদ্দীনের সাম্রাজ্য
আলাউদ্দীনের সাম্রাজ্য....
স্বাধীন রাজ্য... ... ...
হিন্দুকুশ পর্ব্বত
কাবুল
গজনী
কাশ্মীর
লাহোর
মুলতান
দিল্লী
বদায়ুন
সিন্ধু
আজমীর
গোয়ালিয়র
চিতোর
অনহিলবারা
বারাণসী
কালিঞ্জর
উজ্জয়িনী
কচ্ছ
ধার
জুনাগড়
নর্ম্মদা
দেবগিরি
কল্যাণ
বরঙ্গল
দ্বারসমুদ্র
কাঞ্চী
তাঞ্জোর
মাদুরা
রামেশ্বর
সিংহল
আসাম
গৌড়
মাইল
০ ১৫০ ৩০০ ৪৫০

করিয়া কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত দিল্লীর অধিকার প্রসারিত করেন। শুধু কাশ্মীর, নেপাল এবং আসাম ছাড়া সমগ্র ভারতবর্ষ তাঁহার অধীন হইয়াছিল। এত বড় সাম্রাজ্য তাঁহার পূর্বে আর কোন মুসলমান শাসক অধিকার করিতে পারেন নাই।

আলাউদ্দীন কেবল রাজ্য জয় করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। তিনি কঠোর শাসক ছিলেন। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিদ্রোহ এবং অশান্তি দমনের সুব্যবস্থা ছিল। তাঁহার আমলে চোর-ডাকাতের উপদ্রব কম ছিল। তিনি নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির মূল্য নির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন। শস্য, চিনি, তৈল, ঘৃত, বস্ত্র, গরু, ঘোড়া প্রভৃতির মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হইয়াছিল। কোন দোকানদার অতিরিক্ত মূল্যে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিলে তাহার কঠোর শাস্তি হইত। মধ্য যুগের আর কোন রাজা মূল্য নিয়ন্ত্রণের এইরূপ ব্যবস্থা করেন নাই।

মাত্র ত্রিশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর খলজী বংশের লোপ হয়, তুঘলুক বংশ দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করে। এই বংশের প্রধান সুলতান মহম্মদ বিন্ তুঘলুকের চরিত্র অতি বিচিত্র ছিল। তাঁহার মত পণ্ডিত সেকালে এদেশের রাজাদের মধ্যে কমই ছিলেন। দর্শন, জ্যোতিষ, গণিত, বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। সাহিত্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি দানশীলতার জন্য প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইস্‌লাম ধর্মে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস ছিল। অথচ এই গুণবান, পণ্ডিত ও দয়ালু সুলতানের আমলেই বিশাল দিল্লী

সাম্রাজ্যের পতন আরম্ভ হইয়াছিল। তিনি ফলাফলের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অবিবেচকের মত কয়েকটি কাজ করেন। অকারণে ক্রোধের বশবর্তী হইয়া তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে প্রজাদের উপর অত্যাচার করেন। তাই কোন কোন ঐতিহাসিক বলিয়াছেন যে তিনি পাগল ছিলেন। কিন্তু সত্যই তিনি পাগল ছিলেন না। তাঁহার মতির স্থিরতা না থাকায় তাঁহার আমলে সুলতানী সাম্রাজ্যের সর্বনাশ হয়।

মহম্মদ বিন্ তুঘলুক একবার খোরাসান ও ইরাক জয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া বহু সৈন্য সংগ্রহ করেন, কিন্তু পরে অর্থাভাবে এই সৈন্যদল ঐ সকল দেশে প্রেরণ করা সম্ভব হয় নাই। আর একবার তিনি হিমালয়ের দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে একটি অঞ্চল অধিকার করিতে চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগে ও খাদ্যাভাবে তাঁহার সৈন্যদল পথেই বিনষ্ট হয়। একবার তামার নোট চালাইবার চেষ্টা করিয়া তিনি প্রচুর অর্থ নষ্ট করেন। দিল্লী হইতে তিনি রাজধানী দৌলতাবাদে (দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত দেবগিরিতে) স্থানান্তরিত করেন। ইহাতে বহু লোকের নানারকম অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।

এই সকল খামখেয়ালী কাজের ফলে দেশের চারিদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। দক্ষিণ ভারতে মুসলমানেরা বাহমনী রাজ্য এবং হিন্দুরা বিজয়নগর রাজ্য স্থাপন করিল। গুজরাটে ও সিন্ধুদেশে বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। বাঙ্গালা দেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করিল। মহম্মদ ভগ্ন হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন। তাঁহার খুড়তুত ভাই ফিরোজ তুঘলুক সিংহাসনে বসিলেন।

নূতন স্থলতান শান্তিপ্রিয় এবং ধর্মভীরু ছিলেন। তিনি বিদ্রোহী প্রদেশগুলি দখল করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন না। একমাত্র বাঙ্গালা দেশ তিনি আক্রমণ করেন, কিন্তু এখানে তিনি দিল্লীর আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই। ইহার পর আর যুদ্ধ-বিগ্রহ না করিয়া সাম্রাজ্যের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তাহা লইয়াই তিনি সন্তুষ্ট রহিলেন। তিনি প্রজাহিতৈষী স্থশাসক ছিলেন। কিন্তু ধর্মসম্বন্ধে তাঁহার বড় গোঁড়ামি ছিল।

ফিরোজ তুঘলুকের মৃত্যুর পর স্থলতানী সাম্রাজ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাঁহার দুর্বল বংশধরদের আমলে আরও কয়েকটি প্রদেশে বিদ্রোহ ছড়াইয়া পড়িল। জৌনপুর, মালব, গুজরাট প্রভৃতি প্রদেশ স্বাধীন হইল। মধ্য এশিয়ার দুর্দান্ত তুর্কী বীর তৈমুর লঙ্গ ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী লুণ্ঠন করিলেন।

ইহার কয়েক বৎসর পরে তুঘলুক বংশের লোপ হইল, দিল্লীর সিংহাসন সৈয়দ বংশের অধিকারে আসিল। সৈয়দ-বংশীয় স্থলতানেরা আরব জাতীয় ছিলেন। তাঁহাদের অধিকার প্রকৃতপক্ষে দিল্লীতেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমগ্র ভারত কতকগুলি স্বাধীন রাজ্যে টুকরা টুকরা হইয়া গিয়াছিল।

সৈয়দ বংশের পরে দিল্লীতে রাজত্ব করেন লোদীবংশীয় তিন জন স্থলতান। তাঁহারা জাতিতে আফগান বা পাঠান ছিলেন। সৈয়দ বংশের রাজ্যের চেয়ে লোদী বংশের রাজ্য বৃহত্তর ছিল, কিন্তু দিল্লীর আগেকার গৌরব ফিরাইয়া আনা আর সম্ভব হয় নাই। শেষে লোদী বংশের শেষ স্থলতানকে

পাণিপথের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করিয়া তৈমুর লঙ্গের বংশধর বাবুর দিল্লীতে মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন।

সুলতানী আমলের সভ্যতা

সুলতানী আমলে ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমান পাশাপাশি বাস করিত, হিন্দুর সভ্যতা মুসলমানকে এবং মুসলমানের সভ্যতা হিন্দুকে প্রভাবিত করিত। দীর্ঘকাল একসঙ্গে বাস করিয়া দুই সম্প্রদায় পরস্পরের ধর্মকে বুঝিতে ও শ্রদ্ধা করিতে শিখিল। ক্রমে দুই ধর্মের মূল তত্ত্ব মিলাইয়া ধর্মনায়কেরা এক নূতন আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। ইঁহাদের মধ্যে কবীর ও নানকের কথা বিশেষভাবে বলিতে হয়।

মুসলমানের ঘরে কবীরের জন্ম হয়। তিনি লেখাপড়া জানিতেন না, তাঁতে কাপড় বুনিয়া জীবিকা নির্বাহ করিতেন। তিনি বলিতেন, ঈশ্বরকে ভালবাসিতে পারিলেই মুক্তি পাওয়া যায়। হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে তিনি কোনরকম পার্থক্য স্বীকার করিতেন না। তাঁহার শিষ্যদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান —দুই সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। তিনি হিন্দী ভাষায় অনেকগুলি 'দোহা' (গান, কবিতা) রচনা করেন। এই দোহাগুলিতে সরল ভাষায় ঈশ্বরের গুণ কীর্তন করা হইয়াছে। কবীরের শিষ্যদিগকে 'কবীরপন্থী' বলা হয়। এখনও উত্তর ভারতে বহু কবীরপন্থী আছে।

নানকের জন্ম হয় পঞ্জাবে, দরিদ্রের গৃহে। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার সংসারে মন ছিল না। তিনি অল্পবয়সে স্ত্রী-পুত্র পরিত্যাগ করিয়া নানা দেশে ভ্রমণ করেন। তিনি

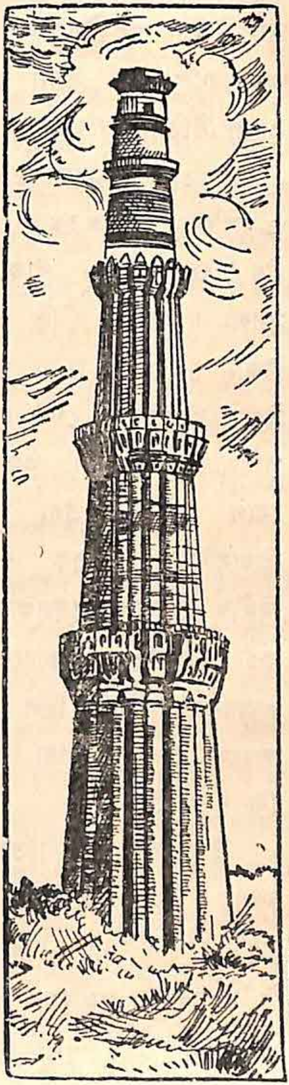
মুসলমানদের মহাতীর্থ মক্কা নগরীতে পর্যন্ত গিয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া তিনি ধর্মের নূতন বাণী প্রচার করেন। তিনি বলিতেন, ঈশ্বর এক এবং হিন্দু-মুসলমান সকলেই ঈশ্বরের নাম কীর্তন করিয়া মুক্তিলাভ করিতে পারে। তিনি জাতিভেদ মানিতেন না। কবীরের মত তাঁহারও হিন্দু ও মুসলমান—দুই সম্প্রদায়ের শিষ্যই ছিল। তাঁহার শিষ্যেরা 'শিখ' নামে পরিচিত। 'শিখ' শব্দের অর্থ শিষ্য। পঞ্জাবে ও কাশ্মীরে বহু শিখের বাস।

মুসলমান রাজাদের মধ্যে কেহ কেহ ধর্ম সম্বন্ধে খুব উদার ছিলেন। তাঁহারা হিন্দুদের উপর কোনরকম অত্যাচার করিতেন না, কখনও হিন্দুদের ধর্মকার্যে বাধা দিতেন না। কাশ্মীরের সুলতান জৈনূল আবিদিনের চরিত্রে এইরূপ উদারতা ছিল। বাঙ্গালার উদারহৃদয় সুলতান হোসেন শাহের কথা তোমরা পরে পড়িবে।

কেবলমাত্র ধর্মের ক্ষেত্রেই যে হিন্দু-মুসলমানের মিলন আরম্ভ হইয়াছিল তাহা নয়। ভাষায় ও সাহিত্যে দুই সম্প্রদায়ের ভাবধারা মিশিয়া যাইতেছিল। এতদিন পর্যন্ত সাহিত্যের ভাষা ছিল পণ্ডিতের ভাষা। হিন্দু পণ্ডিতেরা বই লিখিতেন সংস্কৃতে, মুসলমান পণ্ডিতেরা আরবীতে ও ফারসীতে। ক্রমে জনসাধারণের কথ্য ভাষায় সাহিত্য রচনা আরম্ভ হইল। বাঙ্গালা, মারাঠী প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষার উন্নতি হইল। মুসলমান সুলতানদের মধ্যে কেহ কেহ এই সকল প্রাদেশিক ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। আবার হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের সুবিধার জন্য ফারসী ও হিন্দী ভাষা মিলিয়া

'উর্দু' ভাষার উৎপত্তি হইয়াছিল। এখনও উত্তর ভারতে উর্দু ভাষার প্রচলন আছে।

দিল্লীর তুর্কী সুলতানেরা অনেকেই পণ্ডিতী ভাষা ফারসীর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইতিহাস রচনায় মুসলমান লেখকদের খুব উৎসাহ ছিল। সুলতান নাসির-উদ্দীনের আমলে মিন্‌হাজউদ্দীন 'তবকৎ-ই-নাসিরী' নামে ইতিহাসের একখানি বড় বই লেখেন। মুসলমানদের উত্তর ভারত জয়ের কাহিনী এবং দাসবংশীয় সুলতান-দের বিবরণ এই বইতে পাওয়া যায়। আর একজন বড় ঐতিহাসিক জিয়াউদ্দীন বরণী ফিরোজ শাহ তুঘলুকের আমলে 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' নামে বই লিখিয়াছিলেন। খলজী ও তুঘলুক বংশের রাজত্বকালের বিস্তৃত ইতিহাস এই বইতে দেওয়া হইয়াছে। সুলতানী আমলের প্রধান কবি আমীর খস্‌রু



কুতব মিনার

আলাউদ্দীন খলজীর সভাসদ ছিলেন। তিনি ফারসী ভাষায় অনেকগুলি বাক্য রচনা করেন। আমীর খস্‌রুর কোন কোন কাব্যে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ আছে।

সুলতানী আমলে ভারতের বড় বড় শহরে অনেক প্রাসাদ ও মসজিদ নির্মিত হয়। দিল্লীতে কুতব মিনার নামে একটি উঁচু স্তম্ভ আছে। খাজা কুতবউদ্দীন নামে এক প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধুর কীর্তি স্মরণীয় করিবার জন্য সুলতান কুতব-উদ্দীন এই স্তম্ভের ভিত্তি স্থাপন করেন। ইল্‌তুৎমিসের আমলে ইহার নির্মাণকার্য শেষ হয়। আলাউদ্দীন খলজীও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কুতব মিনারে তিনি একটি সুন্দর তোরণ যোগ করেন। ইহা 'আলাই দরওয়াজা' নামে প্রসিদ্ধ। গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক এবং মহম্মদ বিন্ তুঘলুকের আমলে দিল্লীর উপকণ্ঠে 'তুঘলুকাবাদ' নামে একটি নূতন শহর নির্মাণ করা হইয়াছিল। ভারতের যে সকল অংশ তখনও হিন্দু রাজাদের অধীন ছিল (যেমন, রাজপুতানা) সেই সকল অঞ্চলে হিন্দু রাজারা বহু মন্দির, প্রাসাদ, দুর্গ প্রভৃতি নির্মাণ করিতেন।

হিন্দুদের শিল্প-রীতির সহিত মুসলমানদের শিল্প-রীতির অনেক বিষয়ে পার্থক্য ছিল। আবার কোন কোন প্রদেশে দুইটি শিল্প-রীতির মিশ্রণে এক নূতন শিল্প-রীতি গড়িয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালার অন্তর্গত গৌড়ে, উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত জৌনপুরে এবং গুজরাটে সুলতানী আমলে নির্মিত অনেক প্রাসাদ ও মসজিদ রহিয়াছে। সেগুলি ঐ মিশ্রিত শিল্প-রীতি

অনুসারে নির্মিত। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান এই শিল্প-রীতিতে স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

সুলতানী আমলে বিভিন্ন দেশ হইতে কয়েকজন পর্যটক ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের লেখা বিবরণ পড়িলে সেকালের সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমরা অনেক খবর জানিতে পারি। মিন্‌হাজ্‌উদ্দীন, বরণী প্রভৃতি ঐতিহাসিকেরা রাজা-রাজড়া এবং ওমরাহদের কাহিনী লইয়াই ব্যস্ত, গরীবদের কথা বলিবার অবসর তাঁহারা পাইবেন কিরূপে? কিন্তু কবি আমীর খস্‌রুর কাব্যে সাধারণ লোকের দুঃখ-দারিদ্র্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। রাজসভার জাঁকজমকের মধ্যে তিনি জীবন কাটাইয়াছেন, কিন্তু চাষী ও শ্রমিকের দুর্ভাগ্যের কথা তিনি একেবারে ভুলিতে পারেন নাই।

প্রায় পাঁচশত বৎসর পূর্বে নিকিতিন নামে এক রুশদেশীয় পর্যটক দাক্ষিণাত্যে বাহমনী রাজ্যে ভ্রমণ করেন। বড়লোকের ঐশ্বর্যের সহিত সাধারণ লোকের দারিদ্র্যের তুলনা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "যাহারা গ্রামে বাস করে তাহাদের দুর্দশার সীমা নাই, কিন্তু ওমরাহদের প্রচুর ধনরত্ন আছে এবং তাঁহারা বিলাসে ডুবিয়া থাকেন।" কবি আমীর খস্‌রু লিখিয়াছেন, "গরীবের চোখ হইতে যে রক্ত ঝরিয়া পড়ে তাহাই জমিয়া মুক্তায় পরিণত হয়, আর সেই মুক্তা রাজার মুকুটে শোভা পায়।" এই কথার অর্থ এই যে উপবাসী দরিদ্রকে উৎপীড়ন করিয়া যে কর আদায় করা হয় তাহাই রাজার বিলাসিতার জন্য ব্যয় করা হয়। নিকিতিনের কিছুকাল আগে আবদুর

রেজ্জাক নামে পারস্যদেশীয় এক দূত বিজয়নগর রাজ্যে আগমন করেন। তিনি বলিয়াছেন, রাজার কোষাগারের মধ্যে কতকগুলি বড় বড় কোঠা আছে; সেগুলি বড় বড় সোনার পিণ্ডে ভরিয়া রাখা হয়। রাজার ঐশ্বর্য প্রজার উপকারের জন্য ব্যয় করা হইত না, রাজ-দরবারের জাঁকজমকে ও বিলাসিতায় তাহা শেষ হইয়া যাইত। রাজারা এবং বড়লোকেরা নানা দেশ হইতে ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী সংগ্রহ করিতেন।

সেকালের সমাজে স্ত্রীলোকদের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহার বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। ভারতের কোন কোন প্রদেশে পর্দা প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। বোধ হয় মুসলমানদের প্রভাবই ইহার কারণ। বিজয়নগর রাজ্যে স্ত্রীলোকদের অবস্থা বেশ উন্নত ছিল। বৈদেশিক পর্যটকদের লিখিত বিবরণে দেখা যায়, বিজয়নগরের স্ত্রীলোকেরা ব্যায়ামে ও অস্ত্র-ব্যবহারে দক্ষতা লাভ করিত, শিক্ষায় ও সঙ্গীতে তাহাদের বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। তাহারা কুস্তি করিত, সরকারী হিসাব লিখিত, কোষ্ঠীবিচার করিত, গান গাহিত, বিচারকের কাজ করিত, রাত্রে রাজপ্রাসাদে পাহারা দিত। বিজয়নগরের সমাজে ও রাষ্ট্রে স্ত্রীলোকের যথেষ্ট মর্যাদা ও প্রভাব ছিল।

খ্রীষ্টাব্দ
- ৬৩২ মহম্মদের মৃত্যু
- ৭১১-১২ আরবদের সিন্ধুদেশ জয়
- ৭৫০ আব্বাস বংশীয় খলিফাদের রাজত্বকাল আরম্ভ
- ৯৬২ আল্‌প্তিগীন কর্তৃক গজনী রাজ্য স্থাপন
- ৯৯৮ সুলতান মামুদের গজনীর সিংহাসন লাভ
- ১০৩০ সুলতান মামুদের মৃত্যু
- ১০৩০ সেল্‌জুক তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

খ্রীষ্টাব্দ
- —১১৯২ মহম্মদ ঘূরী কর্তৃক পৃথ্বীরাজের পরাজয়
- —১১৯৩ সালাদিনের মৃত্যু
- —১২০৬ দিল্লীতে সুলতানী আমলের আরম্ভ
- —১২৫৮ আব্বাস বংশীয় খলিফাদের রাজত্বকাল শেষ
- —১৩৯৮ তৈমুরের আক্রমণ
- —১৫২৬ পাণিপথের প্রথম যুদ্ধ ঃ সুলতানী আমলের শেষ ঃ মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

নবম অধ্যায়
মধ্য যুগে বাঙ্গালা
প্রাচীন বাঙ্গালা

বর্তমান সময়ে পশ্চিম বঙ্গ ও পূর্ব পাকিস্তান লইয়া যে বৃহৎ বাঙ্গালা দেশ, তাহা প্রাচীন কালে কয়েকটি খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের মধ্যে গৌড় (উত্তর বাঙ্গালা), বঙ্গ (মধ্য ও পূর্ব বাঙ্গালা), রাঢ় (পশ্চিম বাঙ্গালা), সমতট (দক্ষিণ-পূর্ব বাঙ্গালা) প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়। মগধের পরাক্রান্ত মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাটগণ বাঙ্গালা অধিকার করিয়া এই প্রদেশে রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপন করেন। শুধু শাসনের দিক হইতে নয়, সভ্যতা ও সংস্কৃতির দিক হইতেও মৌর্য ও গুপ্ত আমলে বাঙ্গালার সহিত উত্তর ভারতের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়।

প্রাচীন বাঙ্গালার কোন কোন রাজার নাম ও কীর্তি-কাহিনী লোকসাহিত্য ও লোকসঙ্গীতের মধ্যে বাঁচিয়া

রহিয়াছে। রাণী ময়নামতী এবং তাঁহার পুত্র রাজা গোপীচন্দ্র সম্বন্ধে একটি জনপ্রিয় কাব্য কেবল বাঙ্গালা দেশে নয়, সমগ্র উত্তর ভারতে দীর্ঘকাল যাবৎ প্রচলিত। তাঁহারা দুই জনই যোগে দীক্ষা লইয়া সংসার পরিত্যাগ করেন এবং সাধনার ফলে নাকি অলৌকিক আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী হন।

হর্ষবর্ধনের সময়ে বাঙ্গালার রাজা ছিলেন শশাঙ্ক। মুর্শিদাবাদ জেলায় কর্ণসুবর্ণ নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল। তিনি একবার কনৌজ অধিকার করেন। হর্ষবর্ধন তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্যের খানিকটা অধিকার করেন। হিউয়েন সাঙ্ বলিয়াছেন, বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি শশাঙ্কের ঘোর বিদ্বেষ ছিল এবং তিনি বুদ্ধগয়ার পবিত্র বোধিদ্রুম কাটিয়া ফেলিয়া উহার মূল পুড়াইয়া দিয়াছিলেন।

পাল বংশ

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর দীর্ঘকাল বাঙ্গালা দেশে কোন পরাক্রান্ত রাজা রাজত্ব করেন নাই। সমগ্র প্রদেশটি কয়েকটি খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন রাজবংশের অধীন হয়। ভারতের অন্যান্য রাজ্যের কোন কোন রাজা বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করেন। শেষে বাঙ্গালা দেশে অরাজকতা আরম্ভ হইল; সুশাসনের অভাবে লোকের ধনপ্রাণ বিপন্ন হইয়া পড়িল। এই নিদারুণ অবস্থা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য বাঙ্গালার প্রজারা গোপাল নামক এক ব্যক্তিকে রাজা

নির্বাচন করিল। তিনি এক নূতন রাজবংশ স্থাপন করিলেন; তাহার নাম পাল বংশ। পাল বংশের রাজত্বকাল বাঙ্গালার পরম গৌরবের যুগ।

গোপাল বাঙ্গালা দেশে অরাজকতা দূর করিয়া সুশাসন প্রবর্তন করেন। তাঁহার পুত্র ধর্মপাল বাহুবলে উত্তর ভারতে একটি বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। হর্ষবর্ধনের সময় হইতে উত্তর ভারতের প্রধান নগর ছিল কনৌজ। মৌর্য ও গুপ্ত সম্রাটগণের আমলে পাটলিপুত্রের যে গৌরব ও ঐশ্বর্য ছিল হর্ষের যুগে কনৌজ তাহার অনেকখানি পাইয়াছিল। ধর্মপাল কনৌজ অধিকার করিয়া উত্তর ভারতে নিজের প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। তখন ভারতবর্ষে আরও দুইটি পরাক্রান্ত রাজবংশ ছিল—রাজপুতানা ও মধ্য ভারতের গুর্জর-প্রতিহার বংশ এবং দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূট বংশ। এই দুই রাজবংশের সহিত পাল বংশের বহুদিন যুদ্ধ চলিয়াছিল। কনৌজ পাল বংশের হাত হইতে গুর্জর-প্রতিহার বংশের হাতে গিয়াছিল।

পাল বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট ধর্মপালের পুত্র দেবপাল। হিমালয় হইতে বিন্ধ্য পর্বত পর্যন্ত এবং পূর্ব সমুদ্রতীর হইতে পশ্চিম সমুদ্রতীর পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারতে নাকি তাঁহার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হূণ, উৎকল, কম্বোজ, দ্রাবিড় প্রভৃতি জাতির রাজগণকে তিনি পরাজিত করেন। গুর্জর-প্রতিহার এবং রাষ্ট্রকূট রাজগণের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। আরব বণিকদের লেখায় তাঁহার বিরাট সৈন্য-দলের বর্ণনা পাওয়া যায়। দেবপালের খ্যাতি ভারতের

বাহিরেও প্রচারিত হয়। সুমাত্রা দ্বীপের রাজা বালপুত্রদেব তাঁহার সভায় দূত প্রেরণ করেন।

দেবপালের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই পাল বংশের পতন আরম্ভ হয়। কম্বোজ-জাতীয় বিদেশী রাজারা কিছুকাল উত্তর ও পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেন। কেহ কেহ বলেন, উত্তর-পশ্চিম ভারতে কম্বোজ অঞ্চলে তাঁহাদের আদি বাসভূমি ছিল। অনেকে মনে করেন, কম্বোজ দেশ তিব্বতে। আবার কাহারও মতে ভারতের বাহিরে কাম্বোজ (বা কাম্বোডিয়া) দেশ হইতে ইহারা বাঙ্গালায় আসেন। দাক্ষিণাত্যের চোল বংশীয় রাজা রাজেন্দ্র চোলের সৈন্যদল বাঙ্গালা দেশে গঙ্গাতীর পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

প্রথম মহীপাল দীর্ঘকাল যুদ্ধ করিয়া পাল বংশের গৌরব খানিকটা উদ্ধার করেন, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর আবার গোলযোগ আরম্ভ হয়। উত্তর বাঙ্গালার কৈবর্তেরা বিদ্রোহী হইয়া দ্বিতীয় মহীপালকে পরাজিত ও নিহত করে এবং তাহাদের নায়ক দিব্য (বা দিব্বোক) সিংহাসন অধিকার করেন। দিব্যের মৃত্যুর পর কৈবর্তরাজ ভীমকে পরাজিত ও নিহত করিয়া রামপাল পূর্বপুরুষদের সিংহাসনে বসিলেন। উহার কিছুদিন পরে বাঙ্গালায় পাল বংশের অধিকার বিলুপ্ত হইয়া সেন বংশের রাজত্ব আরম্ভ হইল।

সেন বংশ

সেন রাজাদের পূর্বপুরুষ দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশ হইতে

বাঙ্গালা দেশে আগমন করেন। সেন বংশই বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজবংশ।

সেন রাজাদের মধ্যে বল্লাল সেন ও তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণ সেনের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। বল্লাল সেন নিজে কয়েকখানি সংস্কৃত বই লিখিয়াছিলেন। প্রবাদ আছে, তিনি বাঙ্গালার ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে কৌলীন্য প্রথা প্রবর্তন করেন। এই প্রথা অনুসারে সামাজিক মর্যাদার ভিত্তিতে ব্রাহ্মণ ও কায়স্থদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করা হয়।

লক্ষ্মণ সেন পুরা, বারাণসী ও প্রয়াগ জয় করেন। উত্তর ভারতের রাজগণের মধ্যে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। মুসলমান লেখকেরা তাঁহাকে শক্তিতে ও মর্যাদায় খলিফার সহিত তুলনা করিয়াছেন। তাঁহার বৃদ্ধ বয়সে বক্তিয়ার খল্‌জী নামক তুর্কী সেনানায়ক নবদ্বীপ অধিকার করেন। ইহার পরেও পূর্ববঙ্গে দীর্ঘকাল লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ রাজত্ব করেন।

প্রাচীন বাঙ্গালার সভ্যতা

পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাঙ্গালায় শিক্ষা ও সভ্যতার খুব উন্নতি হইয়াছিল। সেকালে কয়েকজন বড় বড় পণ্ডিত ও লেখক জন্মগ্রহণ করেন। বল্লাল সেনের লেখা 'দান-সাগর' ও 'অদ্ভুতসাগর' দুইখানি মূল্যবান গ্রন্থ। লক্ষ্মণ সেনের 'ধর্মাধ্যক্ষ' (বা বিচারপতি) হলায়ুধ প্রাচীন বাঙ্গালার একজন বড় পণ্ডিত। তিনি ধর্মশাস্ত্র ও আইন সম্বন্ধে সংস্কৃতে কয়েক-খানি বই লিখিয়াছিলেন। সেকালের বৌদ্ধ পণ্ডিতদের মধ্যে

সর্বশ্রেষ্ঠ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতীশ এক রাজ-পরিবারের সন্তান। তিনি সুবর্ণ দ্বীপে (সুমাত্রায়) দ্বাদশ বৎসর বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রচার করেন। তিনি যখন বিক্রমশীলা মহাবিহারের মহাচার্য ছিলেন তখন তিব্বতের রাজা তাঁহাকে ঐ দেশে বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষাদানের জন্য আমন্ত্রণ করেন। নেপাল অতিক্রম করিয়া হিমালয়ের দুর্গম পথে তিব্বতে যাইবার সময় অতীশ দুইবার দস্যুদল কতৃক আক্রান্ত হন। তিনি তের বৎসর তিব্বতে বাস করিয়া বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন এবং সেখানেই পরলোকগমন করেন।

পাল ও সেন রাজাদের সময়ে বাঙ্গালা দেশের সাহিত্যের ভাষা ছিল সংস্কৃত। প্রসিদ্ধ কবি সন্ধ্যাকর নন্দী কৈবর্ত বিদ্রোহ এবং রামপালের কীর্তিকাহিনী অবলম্বনে 'রামচরিতম্' নামক সংস্কৃত কাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের প্রত্যেকটি শ্লোকের দুইটি সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থ করা যায়। এক অর্থে পাওয়া যায় পালবংশীয় রামপালের রাজত্বকালের ইতিহাস, আর এক অর্থে পাওয়া যায় রামায়ণের রামচন্দ্রের কাহিনী। সেকালের আর একজন প্রধান সংস্কৃত কবির নাম জয়দেব। তিনি লক্ষ্মণ সেনের সভাকবি ছিলেন। তাঁহার লেখা কাব্যখানির নাম 'গীতগোবিন্দম্'। তিনি কৃষ্ণভক্ত ছিলেন।

সংস্কৃত ভাষার এত সমাদর সত্ত্বেও পাল ও সেন রাজাদের আমলেই বাঙ্গালা ভাষায় সাহিত্য রচনার সূত্রপাত হয়। চর্যাপদ নামে পরিচিত বৌদ্ধগাথাগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি নিদর্শন এগুলি ধর্মের গূঢ় তত্ত্ব সম্বন্ধে সাধকদের ছড়া বা গান।

পাল রাজারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী এবং বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের সময়ে বাঙ্গালায় ও বিহারে শিক্ষার কেন্দ্র ছিল কয়েকটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহার। পূর্ব বঙ্গের অন্তর্গত পাহাড়পুর নামক স্থানে সোমপুরী মহাবিহারের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে। ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণায় ছিল বিক্রমপুরী বিহার। বর্তমান বিহার রাজ্যের অন্তর্গত বিক্রমশীলা মহাবিহার ছিল মহাপণ্ডিত অতীশের কর্মক্ষেত্র। বিহার রাজ্যে ওদন্তপুরী নামে আর একটি প্রসিদ্ধ মহাবিহার ছিল। এই সকল বৌদ্ধ বিহারকে সেকালের বিশ্ববিদ্যালয় বলা যাইতে পারে। সেকালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেরা এই সকল বিহারে বাস করিয়া দেশ-দেশান্তর হইতে আগত ছাত্রদিগকে নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিতেন।

প্রাচীন বাঙ্গালার সহিত নেপাল, তিব্বত, ব্রহ্মদেশ, সিংহল, সুমাত্রা, যবদ্বীপ প্রভৃতি দেশের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। বাণিজ্যবিস্তার, ধর্মপ্রচার প্রভৃতি নানা কার্য উপলক্ষে সেকালের বাঙ্গালীরা নানা দেশে যাইত। তাম্রলিপ্তি একটি সমৃদ্ধ বন্দর ছিল। এখান হইতে সিংহল, চীন প্রভৃতি বহু দূর দেশে জাহাজ যাইত। ফা-হিয়ান এই বন্দর হইতে জাহাজে উঠিয়া চীন দেশে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

প্রাচীন কালের বাঙ্গালীদের সাধারণ খাদ্য ছিল শাক এবং অন্যান্য ব্যঞ্জনসহ ভাত। মাছ, মাংস এবং দধি, পায়স, ক্ষীর প্রভৃতি দুগ্ধজাত দ্রব্য বড়লোকদের ভাগ্যেই জুটিত। ভাল খাওয়ার উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায় না। মাংসের

মধ্যে হরিণের মাংস লোকের খুব প্রিয় ছিল। ফলের মধ্যে কলা, তাল, আম, কাঁঠাল, নারিকেল প্রভৃতি সকলেই খাইত।

ধুতি ও শাড়ীই ছিল সেকালের বাঙ্গালার সাধারণ পরিধেয়। তখন সেলাই করা জামা ব্যবহার করা হইত না; ধনীদের মধ্যে পুরুষেরা উত্তরীয় এবং মেয়েরা ওড়না ব্যবহার করিতেন। শাড়ীর আঁচল বা ওড়না ঘোমটা টানিবার জন্য ব্যবহৃত হইত। তখনকার ধুতি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে ছোট থাকিত; হাঁটুর নীচে নামাইয়া কাপড় পরার রীতি ছিল না। যোদ্ধারা চামড়ায় তৈরী পাদুকা ব্যবহার করিত। সাধারণ লোকের মধ্যে কাষ্ঠপাদুকার প্রচলন ছিল।

সেকালের বড়লোকদের প্রধান আমোদ ছিল শিকার বা মৃগয়া। সাধারণ লোকের মধ্যে পাশা ও দাবা খেলার প্রচলন ছিল। মেয়েরা জলক্রীড়া করিত। নৃত্য-গীত-বাদ্যের যথেষ্ট সমাদর ছিল। নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে সামাজিক ও ধর্মসংক্রান্ত উৎসবের একটি প্রধান অঙ্গ ছিল নৃত্য-গীত।

মুসলমান আমলে বাঙ্গালা

নবদ্বীপ জয়ের পর কিছুদিনের মধ্যেই বক্তিয়ার খল্‌জী উত্তর বাঙ্গালার একটি বড় অংশ অধিকার করিয়া বাঙ্গালায় তুর্কী-শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি দিল্লীর সুলতানের অধীনতা স্বীকার করিতেন। তাই এই সময় হইতে বাঙ্গালা দেশ দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বলবনের মৃত্যুর পরে

বাঙ্গালার শাসনকর্তারা প্রায় স্বাধীন ভাবেই এই প্রদেশ শাসন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নামে দিল্লীর অধীনতা স্বীকার করিলেও কাজে দিল্লীর হুকুম মানিতেন না। দিল্লীর সুলতানেরাও বহুদূরবর্তী বাঙ্গালা দেশের ব্যাপারে বেশী নজর দিতেন না। শেষে মহম্মদ বিন্ তুঘলুকের রাজত্বকালে বাঙ্গালা দেশ একেবারে স্বাধীন হইয়া গেল।

বাঙ্গালার প্রথম স্বাধীন সুলতান সামস্উদ্দীন ইলিয়াস শাহের কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দিল্লীর সুলতান ফিরোজ তুঘলুক দুইবার বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করিয়াও তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। ইলিয়াস শাহ দুর্ভেদ্য একডালা দুর্গে আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করেন। মালদহ জেলায় এই দুর্গ অবস্থিত ছিল। ফিরোজ তুঘলুকের পরে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের যুগে দিল্লীর অধিপতিরা আর বাঙ্গালা দেশ আক্রমণ করেন নাই।

ইলিয়াস শাহের বংশধরগণ দীর্ঘকাল বাঙ্গালা দেশে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করেন। তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন সুশাসক ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। সুলতান গিয়াসউদ্দীন পারস্যের প্রসিদ্ধ কবি হাফেজের সহিত পত্রালাপ করিয়াছিলেন।

ইলিয়াস শাহী বংশের পতনের পর স্বাধীন বাঙ্গালার সিংহাসন দিনাজপুরের পরাক্রান্ত হিন্দু জমিদার রাজা গণেশের হস্তগত হয়। তাঁহার পুত্র যদু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া জালালউদ্দীন নামে পরিচিত হন এবং কয়েক বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় পঞ্চাশ বৎসর দুর্বল সুলতান-

গণের শাসনে বাঙ্গালার জনসাধারণ নানাপ্রকারে উৎপীড়িত হয়। আফ্রিকার অন্তর্গত আবিসিনিয়া হইতে আসিত হাবসী সৈন্য। তাহারা অক্ষম সুলতানের নামে লোকের উপর অত্যাচার করিত।

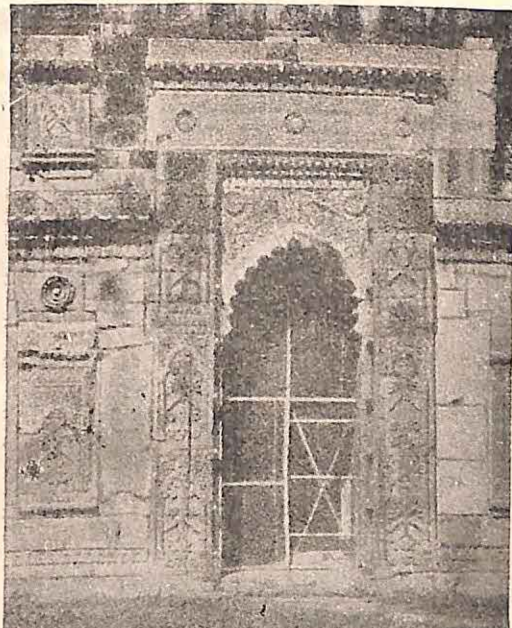
বাঙ্গালী জাতিকে এই অত্যাচার হইতে উদ্ধার করিয়া দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করেন সুলতান হোসেন শাহ। তিনি সম্ভবতঃ আরব জাতীয় ছিলেন। অল্প বয়সে পিতার সঙ্গে বাঙ্গালা দেশে আসিয়া তিনি গৌড়ে সুলতানের দরবারে চাকুরীতে নিযুক্ত হন এবং ক্রমশঃ নানা বিষয়ে দক্ষতার পরিচয় দিয়া সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার কাছে হিন্দু-মুসলমানের কোন প্রভেদ ছিল না। গোপীনাথ বসু তাঁহার উজীর, গৌর মল্লিক তাঁহার সেনাপতি, চৈতন্যদেবের শিষ্য রূপ ও সনাতন তাঁহার উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। হিন্দুরা হোসেন শাহের দরবারে কতখানি মর্যাদা ও ক্ষমতা ভোগ করিত তাহা এই কয়টি নাম হইতেই বুঝিতে পারা যায়। সমসাময়িক লেখকেরা তাঁহাকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

হোসেন শাহের মৃত্যুর প্রায় ৬০ বৎসর পরে দিল্লীর মুঘল সম্রাট আকবর বাঙ্গালা দেশ জয় করেন। বাঙ্গালী হিন্দু-মুসলমান আবার স্বাধীনতা হারাইয়া দিল্লীর অধীন হইল।

মুসলমান আমলে বাঙ্গালার সভ্যতা

মুসলমান রাজত্ব স্থাপনের কিছুকাল পর হইতেই বাঙ্গালার হিন্দু-মুসলমান পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া বাস করিতে

আরম্ভ করে, দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। আচার-ব্যবহারে এবং পোষাকে হিন্দুরা মুসলমানী রীতি অনুসরণ করিতে থাকে। মুসলমানদের অনুকরণে হিন্দুদের মধ্যে

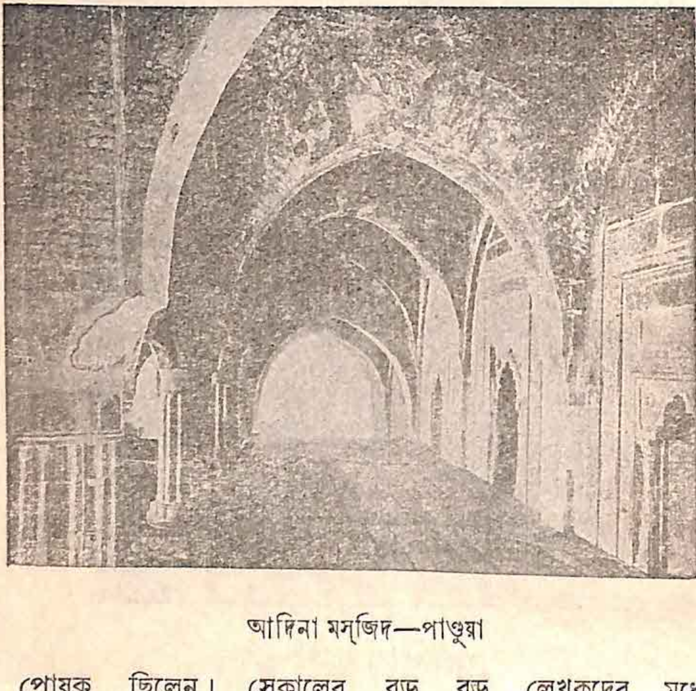


ছোট সোনা মসজিদ—গৌড়

দাড়ি রাখার প্রচলন হয়। হিন্দুরা সযত্নে ফারসী ভাষা পড়িতে থাকে। সেকালে অনেক ধর্মপ্রাণ মুসলমান পীর ও ফকির হিন্দুদের শ্রদ্ধা লাভ করিতেন। আবার মুসলমান সমাজেও হিন্দু রীতিনীতি ও ধর্মসংক্রান্ত প্রথার প্রচলন হয়।

সত্যপীর নামে এক নূতন দেবতা দুই সম্প্রদায়ের পূজা পাইতেন।

মুসলমান আমলে বাঙ্গালা সাহিত্যের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতানেরা বাঙ্গালা সাহিত্যের পৃষ্ঠ-



আদিনা মস্‌জিদ—পাণ্ডুয়া

পোষক ছিলেন। সেকালের বড় বড় লেখকদের মধ্যে অনেকেই সুলতানী দরবারের অনুগ্রহ লাভ করিতেন। মালাধর বসু, বিপ্রদাস, বিজয় গুপ্ত, যশোরাজ খাঁ প্রভৃতি কবিগণ কৃতজ্ঞতার সহিত হোসেন শাহের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। চট্টগ্রামের শাসনকর্তা পরাগল খাঁর নির্দেশে

কবি পরমেশ্বর বাঙ্গালায় মহাভারত রচনা করেন। হোসেন শাহের পুত্র নস্‌রৎ শাহ কয়েকজন হিন্দু কবির প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন।

বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি হইলেও সংস্কৃতের চর্চা বন্ধ হয় নাই। বাঙ্গালা দেশে সংস্কৃত অধ্যয়ন ও অধ্যাপনার প্রধান কেন্দ্র ছিল নবদ্বীপ। নবদ্বাপে এবং অন্যান্য নানা স্থানে অনেক টোল ছিল। সাধারণতঃ হিন্দু জমিদার ও ধনী ব্যক্তিদের দানে টোলের ব্যয় নির্বাহ হইত। ছাত্রেরা গুরুগৃহে আসিয়া বিনা ব্যয়ে পড়িত। নব্য ন্যায়শাস্ত্রের আলোচনায় নবদ্বীপের যশ সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

সুলতানী আমলে বাঙ্গালার রাজধানী ছিল মালদহ জেলার অন্তর্গত গৌড় ও পাণ্ডুয়া। সুলতানেরা অনেকগুলি বড় বড় মস্‌জিদ ও সমাধি-স্থান নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পাণ্ডুয়ার আদিনা মস্‌জিদ আকৃতিতে বৃহৎ, কারুকার্যে অপূর্ব। হোসেন শাহ ও তাঁহার পুত্র নস্‌রৎ শাহের আমলে নির্মিত ছোট সোনা মস্‌জিদ ও বড় সোনা মস্‌জিদ, একলাখী কবর, ঘাট-গম্বুজ প্রভৃতি সেকালের প্রসিদ্ধ শিল্পকীর্তি।



বড় সোনা মস্‌জিদ—গৌড়

শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণব ধর্ম

বাঙ্গালা দেশে বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন শ্রীচৈতন্য। প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্বে নবদ্বীপে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম জগন্নাথ মিশ্র, মাতার নাম শচী দেবী। অতি অল্প বয়সে পাণ্ডিত্যের জন্য নবদ্বীপের পণ্ডিত সমাজে তাঁহার সুনাম হইয়াছিল। কিন্তু পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ও সংসারের আকর্ষণ তাঁহাকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। প্রথম যৌবনে সন্ন্যাসী হইয়া তিনি সংসার পরিত্যাগ করেন। তখন বাঙ্গালায় হোসেন শাহের রাজত্ব চলিতেছে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি দীর্ঘকাল প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন। জীবনের শেষভাগ তিনি পুরীতে কাটাইয়াছিলেন। সেখানেই তাঁহার মৃত্যু হয়।

বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে বাঙ্গালার অনেক কুপ্রথা ও কুসংস্কার দূর হইয়াছিল। বৈষ্ণব কবিরা বাঙ্গালা সাহিত্যের অনেক উন্নতি করিয়াছিলেন। শ্রীচৈতন্য এবং শিখগুরু নানক একই সময়ে ধর্মপ্রচার করেন।

খ্রীষ্টাব্দ

—৬৩৭ (আনুমানিক) শশাঙ্কের মৃত্যু

—৬৪৭ (আনুমানিক) হর্ষবর্ধনের মৃত্যু

—৭৫০ (আনুমানিক) গোপাল কর্তৃক পাল বংশ প্রতিষ্ঠা

—৭৭০ (আনুমানিক) ধর্মপালের রাজ্যলাভ

—৮১০ (আনুমানিক) দেবপালের রাজ্যলাভ

—১০৭৫ (আনুমানিক) কৈবর্ত বিদ্রোহ

—১১৫৮ (আনুমানিক) বল্লাল সেনের রাজ্যলাভ

—১১৭৯ (আনুমানিক) লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যলাভ

—১২০১ বক্তিয়ার খলজীর নবদ্বীপ জয়

—১৩৪২ ইলিয়াস শাহের স্বাধীনতা ঘোষণা

—১৪১৮ রাজা গণেশের মৃত্যু

খ্রীষ্টাব্দ
- —১৪৮৬ শ্রীচৈতন্যদেবের জন্ম
- —১৪৯৩-১৫০৯ হোসেন শাহের রাজত্বকাল
- —১৫৩৩ শ্রীচৈতন্যদেবের তিরোভাব
- —১৫৭৫ আকবরের বাঙ্গালা জয়

দশম অধ্যায়

মোঙ্গল সাম্রাজ্য ঃ মার্কো পোলোর ভ্রমণ

চেঙ্গিস খাঁ

দিল্লীতে যখন দাসবংশীয় সুলতানেরা রাজত্ব করিতেছিলেন তখন দুর্ধর্ষ মোঙ্গল জাতির নায়ক দিগ্বিজয়ী বীর চেঙ্গিস খাঁ এশিয়া এবং ইউরোপের নানা দেশ বিধ্বস্ত করিয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। মোঙ্গলেরা মধ্য এশিয়ার অধিবাসী যাযাবর জাতি। তাহারা তাঁবুতে বাস করিত, অশ্বারোহণে ক্ষিপ্র বেগে এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়াইত। তাহাদের প্রধান খাদ্য মাংস এবং ঘোটকীর দুগ্ধজাত দ্রব্য। তাহাদের জীবিকা অর্জনের প্রধান উপায় পশুচারণ, শিকার ও যুদ্ধ। তাহাদের যুদ্ধের প্রধান অস্ত্র তীর-ধনু। শিক্ষা-সভ্যতায় মোঙ্গলেরা মোটেই অগ্রসর হইতে পারে নাই, কিন্তু সাহসে ও যুদ্ধ-কৌশলে সেকালে তাহাদের সমকক্ষ জাতি আর ছিল না।

চীন দেশে নানাবিধ রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগে

চেঙ্গিস খাঁ মোঙ্গল যোদ্ধা লইয়া এক বিরাট সৈন্যদল গঠন করেন। মধ্য এশিয়ার তাতারদিগকে বশীভূত করিয়া তিনি চীন সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন; পিকিং শহর তাঁহার হস্তগত হয়। তারপর তিনি তুর্কীস্তান অধিকার করেন। এই সময়ে মধ্য এশিয়ার শ্রেষ্ঠ নগর সমরকন্দ তাঁহার অধীন হয়। ইল্‌তুৎমিস যখন দিল্লীর সুলতান তখন চেঙ্গিস খাঁ সসৈন্যে পঞ্জাবে উপস্থিত হন। তিনি



চেঙ্গিস খাঁ

ভারতবর্ষ জয়ের চেষ্টা করেন নাই, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পর একশত বৎসরকাল মোঙ্গলেরা বারবার উত্তর-পশ্চিম ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করে। পশ্চিমে চেঙ্গিস খাঁর বাহিনী ইউরোপের অন্তর্গত রুশিয়া দেশের দক্ষিণ ভাগ অধিকার করে। রুশ সৈন্যদল

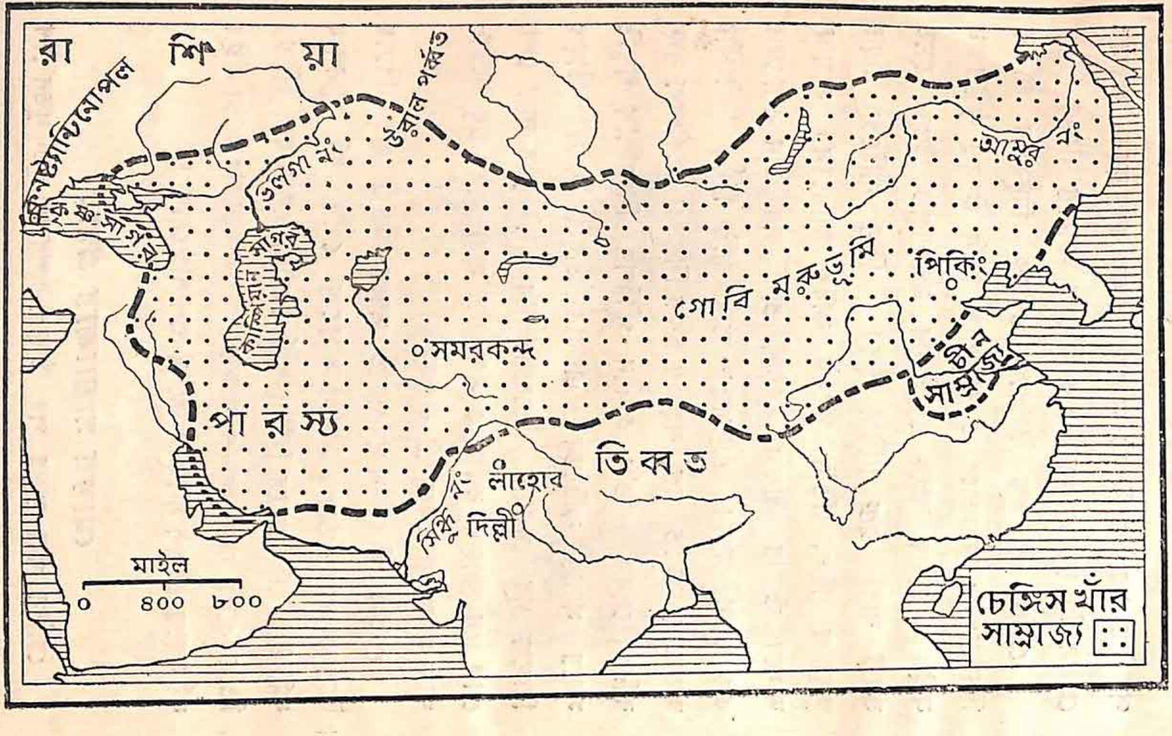
পরাজিত হয় এবং কিয়েভ নগরের শাসক বন্দী হন। অকস্মাৎ চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার দিগ্বিজয় অসমাপ্ত থাকে।

চেঙ্গিস খাঁ যুদ্ধ উপলক্ষে ভয়ানক নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিলেন; অত্যাচারে ও রক্তপাতে তিনি কখনও কুণ্ঠিত হন নাই। প্রবাদ আছে যে তাঁহার জন্মকালেও তাঁহার হাতে জমাট বাঁধা রক্ত লাগিয়া ছিল। কিন্তু সাহিত্যে তাঁহার অনুরাগ ছিল, তিনি নিজেই কবিতা লিখিতেন। সাম্রাজ্য শাসনে তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা ছিলেন চীন সাম্রাজ্যের এক ভূতপূর্ব মন্ত্রী। এই সহৃদয় জ্ঞানী ব্যক্তি নিষ্ঠুর দিগ্বিজয়ীর অত্যাচার হইতে বহু শহর ও সুন্দর শিল্পদ্রব্য সুকৌশলে রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি প্রাচীন পুঁথিপত্র, শিলালিপি প্রভৃতি সযত্নে সংগ্রহ করিতেন। একবার তাঁহার শত্রুরা তাঁহার বিরুদ্ধে ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ আনে। বিচারের সময় দেখা গেল যে তাঁহার ব্যক্তিগত সম্পত্তির মধ্যে আছে শুধু কয়েকখানি দলিল আর কয়েকটি বাদ্যযন্ত্র।

চেঙ্গিস খাঁর শাসন-পদ্ধতি সম্বন্ধে একটি কথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম, ইসলাম ধর্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মে বিশ্বাসী লোক বাস করিত। তিনি ধর্মের জন্য কখনও কাহারও উপর অত্যাচার করেন নাই। ধর্ম সম্বন্ধে এইরূপ সহিষ্ণুতা বিশেষ প্রশংসার যোগ্য।

মোঙ্গল সাম্রাজ্যের প্রসার

চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর পর তাঁহার বংশধরগণ নূতন নূতন দেশ


রা শি য়া
কনস্টান্টিনোপল
উরাল পর্বত
ভলগা নং
কৃষ্ণ সাগর
কাস্পিয়ান সাগর
আমুর নং
গোবি মরুভূমি
পিকিং
সমরকন্দ
চীন সাম্রাজ্য
পা র স্য
তি ব্ব ত
লাহোর
সিন্ধু নং
দিল্লী
মাইল
0 ৪০০ ৮০০
চেঙ্গিস খাঁর সাম্রাজ্য

জয় করিয়া মোঙ্গল সাম্রাজ্যের সীমা আরও অনেক দূর বিস্তার করেন। সমগ্র চীন দেশ এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তিব্বত, পারস্য, সিরিয়া প্রভৃতি দেশ মোঙ্গলেরা জয় করে। চেঙ্গিস খাঁর পৌত্র হুলাগু খলিফাদের রাজধানী বাগ্‌দাদ অধিকার করিয়া খলিফাকে সবংশে হত্যা করেন। সমৃদ্ধিশালী নগরীটি নিষ্ঠুর ভাবে বিধ্বস্ত করা হয় এবং অধিবাসীদের মধ্যে



হুলাগুর বাগ্‌দাদ অবরোধ

অধিকাংশ নিহত হয়। আব্বাস বংশীয় খলিফাদের এই শোচনীয় পরিণাম মোঙ্গল দিগ্বিজয়ের ইতিহাসে একটি প্রধান ঘটনা।

চেঙ্গিস খাঁর সময়েই রুশিয়ার খানিকটা মোঙ্গলদের

অধিকারে আসে। তাঁহার বংশধরগণ প্রায় সমগ্র রুশিয়া অধিকার করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পোল্যাণ্ড এবং হাঙ্গেরী পর্যন্ত জয় করেন। মোঙ্গল দিগ্বিজয়ীদের সমরকৌশল প্রশংসনীয়। সেকালের ইউরোপীয় সৈন্যরা মোঙ্গল সৈন্যদের মত যুদ্ধে নিপুণ ছিল না। মোঙ্গলেরা যে কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই সাহস ও রণকৌশল দেখাইত তাহা নহে। যুদ্ধের পূর্বে তাহারা শত্রুপক্ষের শক্তি ও রণ-নীতি সম্বন্ধে খোঁজখবর লইত। পূর্ব ইউরোপ জয়ে মোঙ্গলদের সাফল্যের ইহা একটি প্রধান কারণ।

চেঙ্গিস খাঁর পৌত্র, হুলাগুর ভ্রাতা কুব্‌লাই মোঙ্গল সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া চীন দেশে ইহার কেন্দ্র স্থাপন করেন। কিন্তু সাম্রাজ্যের পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত চীন দেশ হইতে মধ্য এশিয়া, পশ্চিম এশিয়া এবং পূর্ব ইউরোপ শাসন করা সম্ভব ছিল না। ফলে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন শাসক প্রায় স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে লাগিলেন।

এশিয়া এবং ইউরোপ—দুই মহাদেশ ব্যাপিয়া মোঙ্গলেরা যে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল তাহার তুলনা মধ্য-যুগের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এই সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ফলে এশিয়া এবং ইউরোপের মধ্যে যাতায়াতের পথ খুলিয়া যায়, দুই মহাদেশের মধ্যে খানিকটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। মোঙ্গলদের দরবারে ইউরোপের নানা দেশ এবং আরব, পারস্য, ভারতবর্ষ প্রভৃতি দেশ হইতে বহু জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সমাগম হইত; পুরোহিত, পণ্ডিত, বণিক, শিল্পী

প্রভৃতি নানা শ্রেণীর লোক মোঙ্গল সাম্রাজ্যে ভ্রমণ করিতেন। ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার হইত, ভাব-বিনিময়ের সুযোগ পাওয়া যাইত। সুতরাং মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে মোঙ্গল সাম্রাজ্যের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে।

মার্কো পোলোর ভ্রমণ

মোঙ্গলদের ইতিহাস, আচার-ব্যবহার, শাসন-পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা বেশী কিছু জানি না। তবে কুব্‌লাই খাঁর দরবার এবং তাঁহার আমলে চীনের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক সংবাদ প্রসিদ্ধ ইটালীয় পর্যটক মার্কো পোলোর বিবরণীতে পাওয়া যায়।

মার্কো পোলো ইটালীর অন্তর্গত ভেনিসের অধিবাসী ছিলেন। ভেনিসের সহিত জেনোয়ার যুদ্ধে যোগদান করিয়া তিনি শত্রুহস্তে বন্দী হন। বন্দী অবস্থায় জেনোয়ায় বাস-কালে তিনি একজন সঙ্গীর নিকট নিজের ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণনা করেন। সঙ্গীটি উহা লিখিয়া রাখে এবং পরে পুস্তকাকারে প্রকাশ করে।

মার্কো পোলোর পিতা ও পিতৃব্য ভেনিসের সমৃদ্ধ বণিক ছিলেন। তাঁহারা দক্ষিণ রুশিয়া এবং মধ্য এশিয়া অতিক্রম করিয়া চীন দেশে কুব্‌লাই খাঁর দরবারে উপস্থিত হন। কুব্‌লাই খাঁ তাঁহাদিগকে খ্রীষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন এবং ইউরোপ হইতে একশত খ্রীষ্টান পণ্ডিতকে চীন দেশে লইয়া আসিতে অনুরোধ করেন। এই নির্দেশ

অনুসারে তাঁহারা ইউরোপে ফিরিয়া আসেন এবং দুই বৎসর পরে মার্কো পোলোকে সঙ্গে লইয়া আবার চীন দেশে যাত্রা করেন।

স্থলপথে পশ্চিম এশিয়া ও মধ্য এশিয়া অতিক্রম করিয়া পিতা ও পিতৃব্যের সঙ্গে মার্কো পোলো কুব্‌লাই খাঁর রাজধানী পিকিং শহরে উপস্থিত হইলেন। সেখানে তাঁহাকে সরকারী



কুব্‌লাই খাঁ

চাকুরী দেওয়া হইল। দীর্ঘ ষোল বৎসর চীন দেশে কাটাইবার পর তাঁহাদের স্বদেশে ফিরিবার ইচ্ছা হয়। সেই সময়ে এক মোঙ্গল রাজকন্যাকে জলপথে চীন হইতে পারস্যে পাঠাইবার

ব্যবস্থা হইতেছিল। পিতা ও পিতৃব্য সহ মার্কো পোলো তাঁহার সঙ্গী হইলেন। দক্ষিণ চীনের এক বন্দরে তাঁহারা জাহাজে উঠেন। পথে সুমাত্রা দ্বীপে ও দক্ষিণ ভারতে কিছুকাল অপেক্ষা করিয়া ঐ জাহাজ দুই বৎসর পরে পারস্যে আসে। পারস্য হইতে পিতা ও পিতৃব্য সহ মার্কো পোলো ভেনিস চলিয়া গেলেন। সেখানে তাঁহাদের প্রতিবেশীরা তাঁহাদের অদ্ভুত পোষাক দেখিয়া তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে নাই। তাঁহাদের আচার-ব্যবহারও বদলাইয়া গিয়াছিল। শেষে প্রতিবেশীদের বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য তাঁহারা এক ভোজ দিলেন, চীন হইতে যে সকল মণিমুক্তা আনিয়াছিলেন তাহা তাহাদিগকে দেখাইলেন। তখন তাঁহাদিগকে সমাজে নেওয়া হইল, কিন্তু চীন দেশের আকার ও ঐশ্বর্য সম্বন্ধে তাঁহারা যে সকল কথা বলিতেন তাহা কেহ বিশ্বাস করিত না।

মার্কো পোলো কেবল চীন দেশের কথা বলেন নাই। জাপানে নাকি অনেক সোনা ছিল। ব্রহ্মদেশের রাজাদের বিরাট সৈন্যদল ছিল, যুদ্ধের সময় হাতী ব্যবহার করা হইত। দক্ষিণ ভারতের কাকতীয় রাজ্যের রাণী রুদ্রাম্বার শাসন-দক্ষতার তিনি খুব প্রশংসা করিয়াছেন। সেখানকার যোগীরা মার্কো পোলোর মনে বিস্ময় জাগাইয়াছিল।

তৈমুরলঙ্গ

চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যুর দেড়শত বৎসর পরে তাঁহার এক বংশধর

এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার নাম তৈমুর। তিনি খোঁড়া ছিলেন বলিয়া তৈমুর লঙ্গ নামে পরিচিত। তাঁহার রাজধানী ছিল সমরকন্দ। তিনি তুরস্কের সুলতানকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া একটি খাঁচার মধ্যে রাখিয়াছিলেন। তুঘলুক বংশের পতনের কালে তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী লুণ্ঠন করেন এবং একলক্ষ বন্দীকে হত্যা করেন। তাঁহার নিষ্ঠুরতার সীমা ছিল না। তিনি মানুষের কাটা মাথা বড় বড় স্তূপের মত সাজাইয়া রাখিতেন। দিগ্বিজয়ী হইলেও তিনি চেঙ্গিস খাঁর মত অত বড় এবং স্থায়ী সাম্রাজ্য গঠন করিতে পারেন নাই।

খ্রীষ্টাব্দ	—১২১১ ইল্‌তুৎমিসের রাজ্যলাভ
	—১২২১ চেঙ্গিস খাঁর ভারত আক্রমণ
	—১২২৭ চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যু
	—১২৪০ মোঙ্গলদের রুশিয়া বিজয়
	—১২৪১ মোঙ্গলদের পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গেরী বিজয়
	—১২৫৮ হুলাগু কর্তৃক বাগ্‌দাদ অধিকারঃ আব্বাসবংশীয় খলিফা সাম্রাজ্যের পতন
	—১২৬০ কুব্‌লাই খাঁ কর্তৃক চীনের সিংহাসন অধিকার
	—১২৯৪ কুব্‌লাই খাঁর মৃত্যু
	—১২৯৫ মার্কো পোলোর ভেনিসে প্রত্যাবর্তন
	—১৩৯৮ তৈমুর লঙ্গের ভারত আক্রমণ

একাদশ অধ্যায়

ইউরোপে তুর্কী সাম্রাজ্য স্থাপন

মোঙ্গলদের পরে মধ্য এশিয়ার আর একটি জাতি এশিয়া ও ইউরোপের কতকগুলি দেশ জয় করিয়া একটি সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ইহারা ইতিহাসে 'অটোম্যান তুর্কী' (Ottoman Turks) নামে পরিচিত। তোমরা পূর্বে সেল্‌জুক তুর্কীদের কথা শুনিয়াছ। সেল্‌জুক নামক নায়কের নাম অনুসারে তুর্কী জাতির এক শাখা 'সেল্‌জুক তুর্কী' নামে পরিচিত। আর ওস্‌মান নামক নায়কের নাম অনুসারে তুর্কী জাতির আর এক শাখা 'অটোম্যান তুর্কী' নামে পরিচিত। ওস্‌মান নামটিকে বিকৃত করিয়া ইউরোপীয় ভাষায় 'অটোম্যান' করা হইয়াছিল।

'অটোম্যান' তুর্কীরা প্রথমে মধ্য এশিয়ার অন্তর্গত পশ্চিম তুর্কীস্তানে বাস করিত। চেঙ্গিস খাঁর আক্রমণকালে তাহারা পশ্চিম দিকে পলায়ন করিতে থাকে। বহু নদ-নদী, পর্বত ও মরুভূমি অতিক্রম করিয়া তাহারা এশিয়া মাইনরের অন্তর্গত অ্যানাটোলিয়া অঞ্চলে উপস্থিত হয়। সেখানে পূর্বেই সেল্‌জুক তুর্কীরা স্থায়ী বসতি স্থাপন করিয়াছিল। একটি যুদ্ধে সেল্‌জুক তুর্কীদিগকে সাহায্য করিয়া 'অটোম্যান' তুর্কীরা তাহাদের বন্ধুতা লাভ করিল এবং তাহাদের সাহায্যে জমি দখল করিয়া

অ্যানাটোলিয়ায় বাস করিতে লাগিল। ক্রমে সেল্‌জুক তুর্কীরা দুর্বল হইয়া পড়িল, 'অটোম্যান' তুর্কীদের ক্ষমতা বাড়িতে লাগিল। ওস্‌মান নামক পরাক্রান্ত নায়কের নেতৃত্বে তাহারা একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করে।

অ্যানাটোলিয়ায় রাজ্য স্থাপন করিয়া 'অটোম্যান' তুর্কীদের আশা মিটিল না, তাহারা নানা দিকে রাজ্যবিস্তার করিতে লাগিল। তখন বাইজেন্টিন সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। এশিয়ার যে সকল দেশ এই সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল সেগুলি ক্রমশঃ 'অটোম্যান' তুর্কীরা দখল করিয়া লইল। ক্রমে ইউরোপের দিকে তাহাদের দৃষ্টি পড়িল। ইউরোপে বাইজেন্টিন সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলি ক্রমে ক্রমে তাহাদের অধিকারে আসিল। কিন্তু দুর্ধর্ষ দিগ্বিজয়ী তৈমুর লঙ্গের নিকট তাহাদিগকে পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। 'অটোম্যান' তুর্কীদের পরাক্রান্ত সুলতান তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য হন।

তৈমুর লঙ্গের ভারত আক্রমণের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে 'অটোম্যান' তুর্কীরা বাইজেন্টিন সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্‌ অধিকার করে। দুইবার তাহাদের আক্রমণ ব্যর্থ হয়। শেষে সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ এই প্রাচীন নগরী অধিকার করেন। কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌লের শক্তি ও গৌরব তখন একেবারে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। শহরের বহু অট্টালিকা ভগ্ন স্তূপে পরিণত হইয়াছিল। সেন্ট সোফিয়া গির্জার কোন কোন অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। শহরের লোকসংখ্যা অনেক

কমিয়া গিয়াছিল। কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্‌ আর বাণিজ্যের কেন্দ্র ছিল না। বাণিজ্য না থাকায় ঐশ্বর্যও কম। সম্রাটের সৈন্যদলে চারি হাজারের বেশী লোক ছিল না। শহরের বাহিরে জনহীন ভূমি মরুভূমির মত দেখাইত। এই দুর্বল শহর দুর্ধর্ষ তুর্কীদের আক্রমণ সহ্য করিবে কিরূপে?



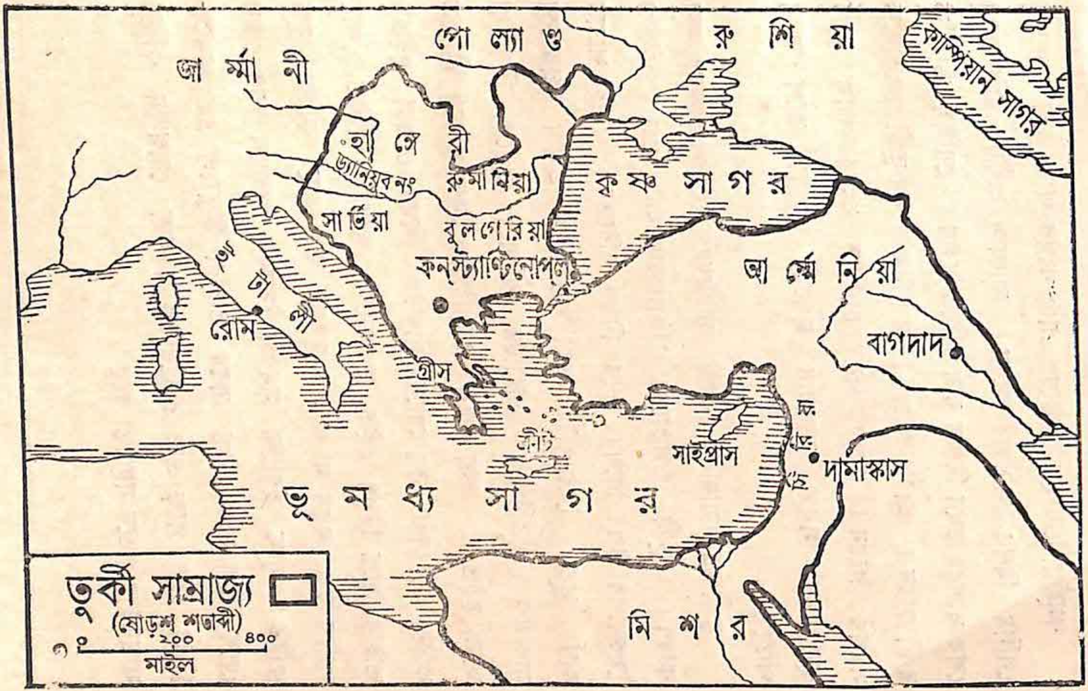
সুলতান দ্বিতীয় মহম্মদ

সুলতান মহম্মদ সত্তর হাজার সৈন্য লইয়া কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্‌ অবরোধ করিলেন। কয়েকশত যুদ্ধ জাহাজ সমুদ্রের দিকে শহরটিকে ঘিরিয়া রহিল। দুর্বল বাইজেন্টিন সম্রাট মাত্র নয় হাজার সৈন্য সংগ্রহ করিলেন। ইউরোপের অন্যান্য দেশ

তাঁহাকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হইল না। তাঁহার প্রজারাও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আগ্রহ দেখাইল না। তুর্কীদের কামানের গোলা শহরের জীর্ণ প্রাচীর ভাঙ্গিয়া ফেলিল। প্রায় দুই মাস অবরোধের পর তুর্কীরা শহরে প্রবেশ করিল। নিরুপায় বাই-জেন্টিন সম্রাট বীরের মত যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিলেন। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের প্রায় এক হাজার বৎসর পরে পূর্ব রোম সাম্রাজ্যের পতন হইল।

বিজয়ী মহম্মদ কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌লে 'অটোম্যান' তুর্কী সাম্রাজ্যের রাজধানী স্থাপন করিলেন। সেণ্ট সোফিয়া গির্জা মস্‌জিদে পরিণত করা হইল। কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌লে খ্রীষ্ট ধর্মের পরিবর্তে ইসলামের প্রাধান্য সূচিত হইল। প্রায় পাঁচ শত বৎসর কাল এই প্রাচীন শহর তুর্কী সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে তুর্কী সাম্রাজ্যের পতন ও 'অটোম্যান' সুলতান বংশের বিলোপ ঘটে। অ্যানাটোলিয়ায় নূতন তুর্কী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্ অধিকারের পূর্বেই তুর্কীরা দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের এক বিস্তৃত অঞ্চল (উত্তর গ্রীস, সার্ভিয়া, বুল-গেরিয়া) জয় করিয়াছিল। পরে দক্ষিণ গ্রীস, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী এবং পোল্যাণ্ড ও রুশিয়ার কিয়দংশ তাহাদের অধিকারভুক্ত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষদিকে তাহারা অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা পর্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু সেখানে কৃতকার্য হইতে পারে নাই। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তুর্কীদের শাসনাধীন ছিল।



জার্মানী
পোল্যাণ্ড
রুশিয়া
কাস্পিয়ান সাগর
হাঙ্গেরী
ড্যানিয়ুব নদী
রুমানিয়া
কৃষ্ণ সাগর
সার্ভিয়া
বুলগেরিয়া
কন্স্ট্যাণ্টিনোপল
আর্মেনিয়া
ইতালী
রোম
বাগদাদ
গ্রীস
ক্রীট
সাইপ্রাস
দামাস্কাস
ভূমধ্য সাগর
মিশর
তুর্কী সাম্রাজ্য
(ষোড়শ শতাব্দী)
০ ২০০ ৪০০
মাইল

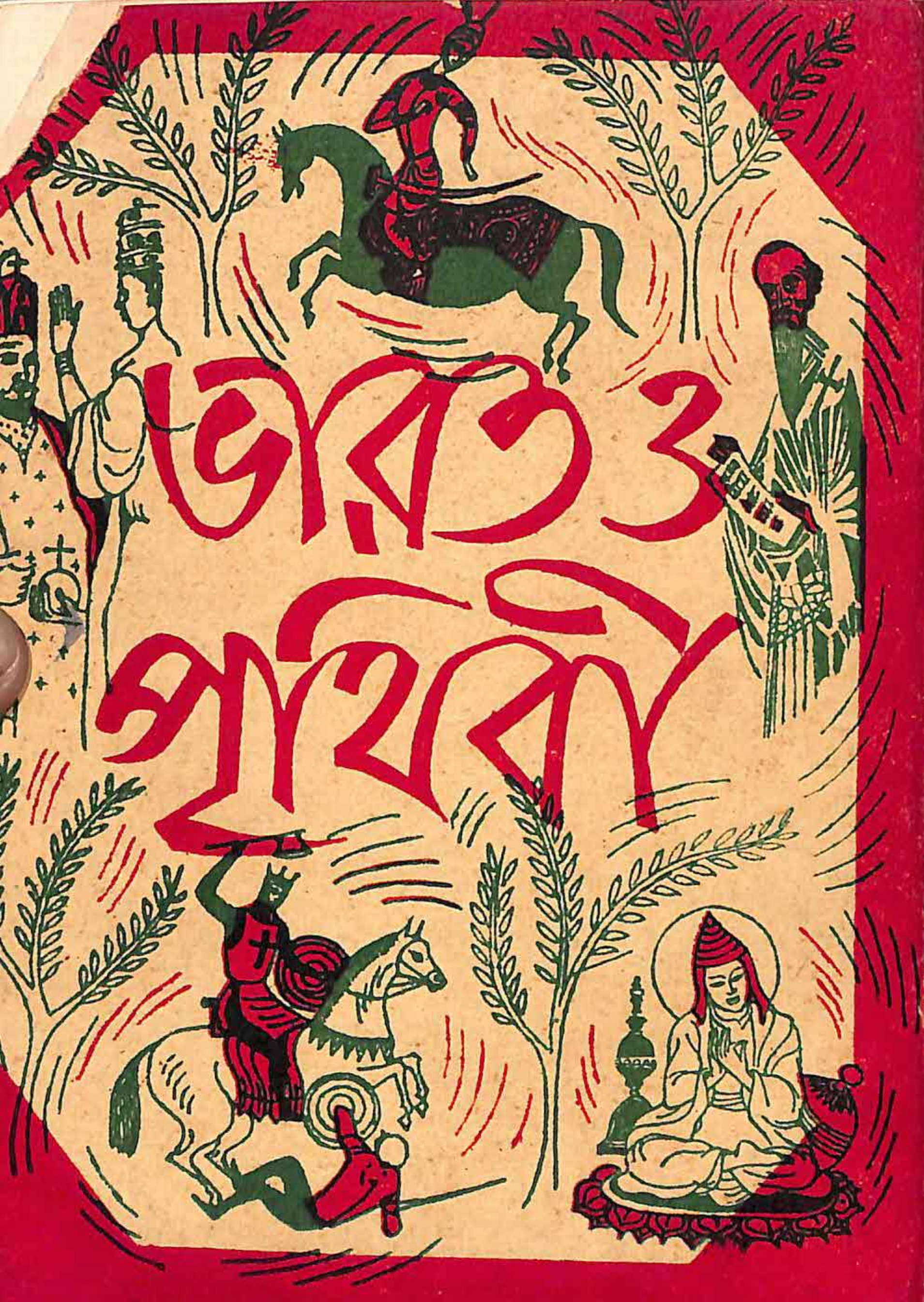
কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্ বিজয়ের ষাট বৎসর পরে তুর্কী সুলতান সেলিম মিশর অধিকার করেন। আব্বাস বংশীয় খলিফাদের শেষ বংশধর তখন মিশরে বাস করিতেছিলেন। সেলিম তাঁহাকে বন্দী করেন। প্রবাদ আছে, তিনি খলিফার পদ তুর্কী সুলতানকে সমর্পণ করেন। ইহার পর চারিশত বৎসর কাল তুর্কী সুলতানেরা সমগ্র মুসলমান জগতে খলিফা রূপে শ্রদ্ধা পাইতেন।

তুর্কীদের সামরিক বলই তাহাদের সাম্রাজ্য গঠনের মূল কারণ। তুর্কী সুলতানের 'Janissaries' নামে পরিচিত সৈন্যদলের উপর বিশেষ ভাবে নির্ভর করিতেন। এই শব্দের অর্থ 'নূতন সৈন্যদল'। তুর্কী সাম্রাজ্যের খ্রীষ্টান প্রজাদের নাবালক পুত্রদিগকে তাহাদের পরিবার হইতে ছিনাইয়া আনা হইত। অল্প বয়সে তাহাদিগকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিয়া সরকারী তত্ত্বাবধানে সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইত। তাহারা যুদ্ধে নিপুণ হইত, সুলতানের অনুগত থাকিত, কোন পারিবারিক বন্ধন না থাকায় মৃত্যুর ভয় তুচ্ছ করিয়া যুদ্ধ করিত। যুদ্ধে ইহাদের সমকক্ষ সৈন্যদল সেকালে আর কোন দেশে ছিল না। কিন্তু ক্রমে তাহারা উচ্ছৃঙ্খল এবং ক্ষমতা-লিপ্সু হইয়া পড়ে এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে যোগদান করিয়া সাম্রাজ্যের পতনে সহায়তা করে।

খ্রীষ্টাব্দ

—৩৩০ সম্রাট কন্‌স্ট্যাণ্টাইন কর্তৃক কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্‌ স্থাপন
—৩৯৫ রোম সাম্রাজ্য দুইভাগে বিভাগ
—৪৭৬ 'বর্বর' জাতিসমূহের আক্রমণে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের বিলোপ
—১২২৭ চেঙ্গিস খাঁর মৃত্যু
—১২৯৯-১৩২৬ ওস্‌মানের রাজত্বকাল
—১৪০২ তৈমুর লঙ্গ কর্তৃক 'অটোম্যান' সুলতানের পরাজয়
—১৪৫৩ তুর্কীদের কন্‌স্ট্যান্টিনোপ্‌ল্‌ অধিকার
—১৬৮৩ তুর্কীদের ভিয়েনা আক্রমণ ও পরাজয়

———


ভারত ও
পৃথিবী